দেশের কথা



শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

বঙ্গীয় ও আসামের শিক্ষাবিভাগ কর্ত্তৃক উচ্চ ও মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের

চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে অনুমোদিত

(২০. ৮. ১৯৪২ তারিখের 'কলিকাতা গেজেট' এবং ১. ১২. ৪৮ তারিখের 'আসাম গেজেট' দ্রষ্টব্য)

দেশের কথা

ভারত গভর্ণমেণ্টের ডিরেক্টর অব আর্কিভস্ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

ইতিহাসের ভূতপূর্ব্ব 'আশুতোষ' অধ্যাপক

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

এম. এ., পি-এচ. ডি., বি. লিট. (অক্সন), ডি. লিট. (অনারারি দিল্লী)

প্রণীত

বাণীমন্দির

১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

২, বাঙ্গালাবাজার, ঢাকা।

মূল্য বার আনা

প্রকাশক :

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত, বি. এ.

১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

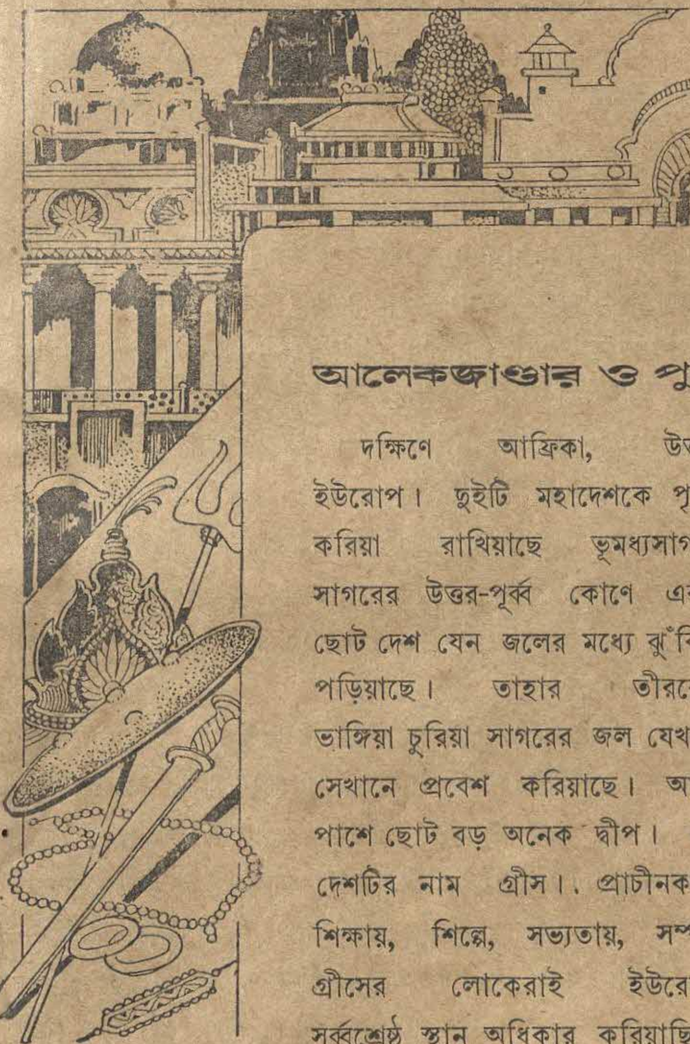
দশম সংস্করণ : ১৯৪৯

মুদ্রাকর—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস

৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

সূচীপত্র



আলেকজাণ্ডার ও পুরু

দক্ষিণে আফ্রিকা, উত্তরে ইউরোপ। দুইটি মহাদেশকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে ভূমধ্যসাগর। সাগরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে একটি ছোট দেশ যেন জলের মধ্যে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তাহার তীররেখা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সাগরের জল যেখানে সেখানে প্রবেশ করিয়াছে। আশে পাশে ছোট বড় অনেক দ্বীপ। এই দেশটির নাম গ্রীস।. প্রাচীনকালে শিক্ষায়, শিল্পে, সভ্যতায়, সম্পদে গ্রীসের লোকেরাই ইউরোপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। ভূমধ্যসাগর বাহিয়া তাহারা নূতন নূতন দেশের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল। দিকে দিকে তাহারা নূতন নূতন উপনিবেশ স্থাপন

করিয়াছিল। সংখ্যায় গ্রীকেরা কোন দিনই তেমন বেশী ছিল না। অথচ সেকালের সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত সম্রাট্ এই ক্ষুদ্র জাতির নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন। তাই আর কোন জাতিকে গ্রীকেরা সভ্য বলিয়াই স্বীকার করিত না। তাহাদের হিসাবে যাহারা গ্রীক নহে তাহারাই বর্ব্বর।

চিরদিন কাহারও সমান যায় না। শেষে গ্রীসের প্রতিপত্তিও একদিন খর্ব্ব হইল, তাহাও আবার এক বর্ব্বর জাতির বিক্রমে। গ্রীসের কাছেই মাকিডোনিয়া। মাকিডোনিয়ার বর্ব্বর জাতিকে সুসভ্য গ্রীকেরা আগে হিসাবের মধ্যেই ধরে নাই। শেষে এই মাকিডোনিয়ার কাছেই গ্রীসের মাথা নত হইল। মাকিডোনিয়ার রাজা ফিলিপ গ্রীস বিজয় করিলেন।

ফিলিপের পুত্র আলেকজাণ্ডার পিতার চেয়েও বড় বীর। ফিলিপ ক্ষুদ্র গ্রীস জয় করিয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডারের মন অল্পে সন্তুষ্ট হইল না। তিনি বাহির হইলেন সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে।

মাকিডোনিয়ার লোকেরা গ্রীকদিগেরই শিষ্য। কিন্তু গ্রীকেরাও তখন সারা পৃথিবীর খবর রাখিত না। আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিম তীরে যে একটা প্রকাণ্ড মহাদেশ থাকিতে পারে তাহা তাহারা ধারণাই করিতে পারে নাই। পশ্চিম ইউরোপে আলেকজাণ্ডারের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী মিলিবার সম্ভাবনা ছিল না। তাই তিনি তাঁহার বিরাট বাহিনী লইয়া প্রাচ্যদেশ জয় করিতে চলিলেন।

তখন ইরাণের বাদশাহের খুব নাম-ডাক। গ্রীকদিগের সহিত ইরাণের অনেক যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল। মিশর তখন ইরাণের

অধীন। ইরাণী সাম্রাজ্য পিরামিডের দেশ হইতে সিন্ধু নদীর তীরভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ইরাণের বাদশাহের অগণিত সেনা, অফুরন্ত ধন। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের সহিত কয়েকটি যুদ্ধেই তাঁহার পরাজয় হইল। মাকিডোনিয়ার আক্রমণে ইরাণের প্রাচীন সাম্রাজ্য ধ্বংস হইল। আলেকজাণ্ডারের সেনাপতিরা মনে করিলেন পূর্ব্ব দেশ বিজয়ের প্রথম ও প্রধান বাধা দূর হইল। তাঁহারা বিজয়গর্ব্বে পঞ্চনদের সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।



আলেকজাণ্ডার

পাঁচনদীর দেশ পঞ্চনদ ভারতের হিন্দু-সভ্যতার জন্মভূমি। এইখানেই আর্য্যেরা আসিয়া প্রথম বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। এইখানেই বেদ ও বেদান্তের তত্ত্ব প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। সভ্যতায় ও শিক্ষায় তাঁহারা গ্রীকদিগের চেয়ে হীন ছিলেন না। বীরত্বেও তাঁহারা কাহারও নিকট ন্যূনতা স্বীকার করিতে চাহেন নাই। কিন্তু পঞ্চনদের সীমান্তে তখনও কোন বড় সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় নাই। ছোট ছোট রাজা ছোট ছোট জনপদে রাজত্ব করিতেন। কোন কোন জনপদে আবার রাজাই ছিল না। ধনবলে, জনবলে ইরাণ-বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের সহিত তাঁহাদের তুলনাই হইতে পারে না।

কিন্তু ইঁহাদেরই এক নগণ্য রাজার বীরত্বে আলেকজাণ্ডার বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। যদি পঞ্চনদের সমস্ত রাজা একত্র হইয়া আলেকজাণ্ডারের গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইতেন তাহা হইলে কি হইত বলা যায় না।

ঝিলাম নদীর তীরে ছোট একটি আর্য্য জনপদ ছিল। এই জনপদের রাজা ছিলেন পুরু। তক্ষশীলার হিন্দুরাজা বিনাযুদ্ধে আলেকজাণ্ডারের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু পুরু কিছুতেই বিদেশীর নিকট মাথা নত করিলেন না। তিনি স্বাধীনতা ও সম্মান রক্ষার জন্য নির্ভয়ে আলেকজাণ্ডারের সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন। অনেক রথ, হাতী, সাদি ও পদাতিক লইয়া তিনি ঝিলাম নদীর তীরে শিবির সংস্থাপন করিলেন। ইচ্ছা, নদী পার হইবার চেষ্টা করিলেই আলেকজাণ্ডারের সেনা আক্রমণ করিবেন।

কোন ভাল সেনাপতিই অকারণে আপনার অনুচরদিগের জীবন বিপন্ন করেন না, আলেকজাণ্ডারও করিলেন না। তিনি গোপনে অন্য পথে নদী পার হইলেন। তার পরে যে যুদ্ধ হইল তাহাতে পুরুর পরাজয় হইল। তিনি শত্রুর হস্তে বন্দী হইলেন।

যোদ্ধার পক্ষে পরাজয় অপেক্ষাও বড় কলঙ্ক কাপুরুষতা। অদৃষ্টের দোষে পুরু পরাজিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ভীরু ছিলেন না। কোন অবস্থায়, কোন সময়েই তিনি নিজের মর্য্যাদা ভুলিতে পারেন নাই। বন্দী হইয়া তিনি যখন আলেকজাণ্ডারের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন তখন মাকিডোনিয়া-রাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার কাছে কিরূপ ব্যবহার পাইতে প্রত্যাশা কর?" পুরুরাজ নির্ভয়ে উত্তর করিলেন, "আমি রাজা,

এক রাজার প্রতি অন্য রাজা যেরূপ ব্যবহার করে আমি তোমার নিকট ঠিক সেইরূপ ব্যবহারই প্রত্যাশা করি।" আলেকজাণ্ডার বীর, তিনি বীরের মর্য্যাদা জানিতেন। সেইদিন বিজিত পুরু বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের বন্ধু হইলেন। আলেকজাণ্ডার তাঁহার রাজ্য ও সিংহাসন ফিরাইয়া দিলেন। সম্পদের সময়ে মাথা উঁচু করিয়া চলিতে পারে সকলেই, কিন্তু বিপদের সময় যাহার মাথা নীচু হয় না সেইত আসল মানুষ, প্রকৃত বীর। তাই গ্রীকেরা পুরুর কথা ভুলিতে পারে নাই। সংস্কৃত সাহিতে আলেকজাণ্ডারের নাম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু গ্রীক ঐতিহাসিকেরা পুরুর কাহিনী চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন।

পুরুর সহিত সংঘর্ষের পরও আলেকজাণ্ডার পঞ্চনদের কয়েকটি রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। তখন উত্তর ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বড় রাজ্য ছিল মগধ। নন্দবংশের রাজারা সেখানে রাজত্ব করিতেন। পঞ্জাবের ছোট ছোট জনপদের সহিত যুদ্ধ করিয়া আলেকজাণ্ডারের সৈন্যদল শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং তিনি মগধ বিজয়ের আশা পরিত্যাগ করিয়া আবার পশ্চিমে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার সহচরেরা এক নগণ্য রাজার আত্মসম্মানজ্ঞানের যে স্মৃতি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন তাহাতে নিশ্চয়ই বিদেশে ভারতবর্ষের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছিল। দেহের বল অপেক্ষা মনের বল যে শ্রেষ্ঠ, পুরুরাজ আপনার আচরণে তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত ও নন্দবংশ

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের খবর মগধের রাজা রাখিতেন কিনা আমরা জানি না। কিন্তু গ্রীক লেখকেরা বলেন যে মগধের রাজপরিবারের এক যুবক কিছুদিন সম্রাট্ আলেকজাণ্ডারের শিবিরে বাস করিয়াছিলেন। এই যুবকের নাম চন্দ্রগুপ্ত। উত্তরকালে তিনি নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া উত্তর ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট্ হইয়াছিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত আলেকজাণ্ডারের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন নাই। কোন কারণে গ্রীক সম্রাট্ এই নিরাশ্রয় যুবকের প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন। শেষে প্রাণভয়ে চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক শিবির হইতে পলায়ন করিলেন। কিন্তু এত বিপদেও তিনি আপনার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন নাই। আলেকজাণ্ডারের প্রস্থানের পর চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাবে প্রভুত্ব স্থাপন করিলেন। গ্রীক লেখকেরা বলেন যে চন্দ্রগুপ্ত আরণ্য পশু বশীভূত করিতে পারিতেন। একবার একটা সিংহ নাকি নিদ্রিত চন্দ্রগুপ্তের সেবা করিয়াছিল। গ্রীক সেনাপতিগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে একটা বিরাটকায় বন্য হস্তী নাকি স্বেচ্ছায় তাঁহাকে পিঠে তুলিয়া লইয়াছিল।

চন্দ্রগুপ্তের প্রকৃত পরিচয় আমাদের জানা নাই। কেহ কেহ বলেন যে তিনি মগধের নন্দবংশীয় এক রাজারই দাসীপুত্র। তাঁহার মাতা ছিলেন শূদ্রাণী। চন্দ্রগুপ্ত যে নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন রাজমাতা মুরার নাম অনুসারে তাহার নাম হইয়াছিল মৌর্য্যবংশ। আবার কেহ কেহ বলেন যে চন্দ্রগু

পিপ্পলীবনের মোরিয় বংশের ক্ষত্রিয় সন্তান। ইহার কোন্ বিবরণ সত্য এতদিন পরে ঠিক করিবার উপায় নাই। যে বংশেই তাঁহার জন্ম হউক না কেন তিনি যে নিজের চেষ্টায় বড় হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

পঞ্জাব জয় করিবার পরই তিনি মগধ বিজয়ের উদ্যোগ করিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন তক্ষশীলার এক ব্রাহ্মণ। ইহার নাম চাণক্য পণ্ডিত। চাণক্য কৌটিল্য এবং বিষ্ণুগুপ্ত নামেও পরিচিত। তিনি যেমন অসাধারণ পণ্ডিত তেমনই অত্যন্ত কূটবুদ্ধি ছিলেন। কোন কারণে তাঁহার অসন্তোষ-ভাজন হইলে আর অপরাধীর রক্ষা ছিল না। কথিত আছে যে, একবার পথে চলিবার সময় তাঁহার পায়ে কুশাঙ্কুর ফুটিয়াছিল। তাই তিনি যেখানে যত কুশ আছে নষ্ট করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন। মগধের রাজসভায় নাকি একবার তাঁহার ভয়ানক অপমান হইয়াছিল। তাই তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন নন্দবংশ ধ্বংস না করিয়া আর শিখা বন্ধন করিবেন না। চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য উভয়েরই এক উদ্দেশ্য, সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে অচিরে বন্ধুত্ব হইল। তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় নন্দবংশের পতন হইল। চন্দ্রগুপ্ত হইলেন মগধের রাজা, আর চাণক্য হইলেন তাঁহার মন্ত্রী। কয়েক বৎসর আগে চাণক্যের নামের একখানি রাজনীতির বই পাওয়া গিয়াছে।

ইহার পর চন্দ্রগুপ্ত সমস্ত উত্তর ভারতে আপনার আধিপত্য স্থাপন করিলেন। বোধ হয় বিন্ধ্য-পর্ব্বতের ওপারে দক্ষিণাপথেও তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি নিষ্কণ্টকে মগধে রাজত্ব করিতে পারেন নাই।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতিরা তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। সেলুকস নিকাটর বা বিজয়ী সেলুকস নামক একজন গ্রীকবীর পশ্চিম এশিয়ার রাজত্ব পাইয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে পঞ্চনদের সীমান্তে আলেকজাণ্ডার যে কয়েকটি জনপদ জয় করিয়াছিলেন তাহা উদ্ধার করা আবশ্যক। অতএব তিনি অনেক সৈন্যসামন্ত লোকলস্কর লইয়া চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন। কিন্তু মগধের মৌর্য্য রাজার নিকট পরাজিত হইয়া তিনি সন্ধি করিয়া ফিরিয়া গেলেন। এই সন্ধির ফলে সেলুকস চন্দ্রগুপ্তকে কাবুল, হিরাট, কান্দাহার ও বেলুচিস্থান ছাড়িয়া দিলেন, আর চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে পাঁচশত হাতী উপহার দিলেন। এই সময় নাকি সেলুকসের সহিত চন্দ্রগুপ্তের একটা কুটুম্বিতাও হইয়াছিল। বোধ হয়, সেলুকসের একটি কন্যার মগধের রাজপরিবারে বিবাহ হইয়াছিল।

সেলুকসের দূত মেগাস্থিনিস্ বহুদিন চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার লেখা হইতে তখনকার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল বর্ত্তমান পাটনার নিকট পাটলিপুত্রে।

শেষ জীবনে চন্দ্রগুপ্ত নাকি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সামান্য দাসীপুত্রের পক্ষে মগধের সাম্রাজ্য লাভ খুব গৌরবের কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু ধর্ম্মের জন্য স্বেচ্ছায় সাম্রাজ্য ও সিংহাসন ত্যাগ আরও গৌরবের বিষয়।

অশোক

সম্রাট্ অশোক চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র। তাঁহাকেও দিগ্বিজয়ী রাজা বলা যাইতে পারে। কিন্তু তিনি শেষে আর যুদ্ধ করিয়া রাজ্য জয় করিবার চেষ্টা করেন নাই, তিনি চাহিয়াছিলেন ভালবাসার দ্বারা সকলের হৃদয় জয় করিতে।

বৌদ্ধেরা বলেন যে যৌবনে অশোক বড়ই নিষ্ঠুর ছিলেন। সিংহাসনের লোভে তিনি নিজের ভাইদিগকেও হত্যা করিয়াছিলেন। রাজা হইয়াও প্রথমে তাঁহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় নাই। রাজত্বের অষ্টম বর্ষে তিনি কলিঙ্গ জয় করিতে গিয়াছিলেন। সেবার নাকি লক্ষাধিক লোক নিহত আর দেড় লক্ষ লোক বন্দী হইয়াছিল। ইহাদের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া অশোক বড়ই ব্যথা পাইলেন। ইহার পরই তিনি বুদ্ধদেবের প্রচারিত অহিংসার ধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

এই সময় হইতে অশোক নিজের দেশে ও বিদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারে উদ্যোগী হইলেন। জীবের দুঃখ ক্লেশ নিবারণ করাই হইল তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান ব্রত। এই জন্য তিনি রাজ্যের নানাস্থানে পাহাড়ের গায়ে ও পাথরের থামে নানাপ্রকার উপদেশ-বাণী লিখিয়াছিলেন। যাহাতে সাধারণ লোকে এই উপদেশগুলি বুঝিতে পারে তাহার জন্য তাঁহার অনুশাসনগুলি প্রচলিত প্রাকৃত ভাষায় লেখা হইয়াছিল। পেশোয়ার হইতে মহীশূর পর্য্যন্ত অনেক জায়গায় অশোকের অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে। এই সকল অনুশাসনে তিনি সকলকে সত্যকথা বলিতে,

অকারণ জীবহত্যা হইতে বিরত থাকিতে, মাতাপিতাকে ভক্তি করিতে, গুরুজনকে শ্রদ্ধা করিতে বলিয়া গিয়াছেন। একখানি অনুশাসনে তিনি তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে বলিয়াছেন—আমি



অশোক (একখানি তিব্বতীয় চিত্র হইতে)

সকলকে আমার সন্তান বলিয়া মনে করি ; আমি যেমন আমার সন্তানদিগের সকল প্রকারের মঙ্গল ইচ্ছা করি, তেমনই অন্য সকলেরও কুশল কামনা করি।

তিনি নিজের রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় এবং বিদেশের বহু রাজ্যে ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা মহেন্দ্র ও

ভগ্নী সঙ্ঘমিত্রা সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। পশ্চিম এশিয়া ও মিশরের গ্রীক রাজ্যেও তিনি অহিংসার মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য বৌদ্ধ সাধুদিগকে পাঠাইয়াছিলেন।

জীবের ক্লেশ নিবারণের জন্য তিনি অনেক চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। পথিকের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পথের ধারে ধারে কূপ ও জলাশয় খনন করিয়াছিলেন। তাহাদের সুবিধার জন্য রাস্তার দুইপাশে বড় বড় গাছ লাগাইয়া দিয়াছিলেন। শেষ বয়সে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়াও অশোক সন্ন্যাসীর মত জীবনযাপন করিতেন।

হর্ষবর্দ্ধন

অশোকের মৃত্যুর প্রায় আটশত বৎসর পরে আর একজন বিখ্যাত রাজা উত্তর ভারতে আধিপত্য লাভ করেন। ইঁহার নাম হর্ষবর্দ্ধন। হর্ষের পিতা প্রভাকর বর্দ্ধন পঞ্জাবের পূর্ব্ব প্রান্তে একটি ছোট জনপদের রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল থানেশ্বরে। প্রভাকর বর্দ্ধনের দুই পুত্র, এক কন্যা। কন্যার নাম রাজ্যশ্রী। কান্যকুব্জের রাজার সহিত রাজ্যশ্রীর বিবাহ হইয়াছিল।

প্রভাকর বর্দ্ধনের হঠাৎ মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্দ্ধন তখন হূণ নামক বর্ব্বর জাতির সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত। এদিকে প্রভাকর বর্দ্ধনের মৃত্যুর পরই থানেশ্বরে আর একটা দুঃসংবাদ আসিল। নূতন রাজা খবর পাইলেন যে মালবের রাজা তাঁহার ভগ্নীপতিকে হত্যা করিয়া রাজ্যশ্রীকে ধরিয়া লইয়া

গিয়াছেন। রাজ্যবর্দ্ধন তাড়াতাড়ি ভগ্নীকে উদ্ধার করিতে চলিলেন, রাজধানীতে রহিলেন বালক হর্ষ। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ষোল বৎসর।

রাজ্যবর্দ্ধন অনায়াসে মালবরাজকে পরাজিত করিলেন, কিন্তু বিধবা ভগ্নীর কোন সন্ধান পাইলেন না। রাজ্যশ্রী কোন সুযোগে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। কেহ তাঁহার সন্ধান দিতে পারিল না। এদিকে বিপদের উপর বিপদ। কর্ণসুবর্ণের (পশ্চিম বঙ্গ) রাজা শশাঙ্ক বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া রাজ্যবর্দ্ধনকে হত্যা করিয়াছিলেন। এই সংবাদে বালক হর্ষ যে কিরূপ বিপন্ন বোধ করিয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমান করিতে পার। কিন্তু তখন আর তাঁহার ভাবিবার অবসর নাই। ভ্রাতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে হইবে। ভগ্নীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

হর্ষ প্রথম গেলেন শশাঙ্কের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে। শশাঙ্ককে পরাজিত করিয়া তিনি রাজ্যশ্রীর সন্ধানে বাহির হইলেন। কত খুঁজিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার সংবাদ পাইলেন না। অবশেষে তিনি বিন্ধ্য পর্ব্বতের এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে গিয়া শুনিলেন যে নিকটেই অরণ্যের মধ্যে এক অসামান্য রূপবতী বালিকা অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া আত্মহত্যার উদ্যোগ করিতেছে। শুনিয়াই হর্ষের মনে সন্দেহ হইল যে এই হতভাগিনীই তাঁহার আশ্রয়হীনা ভগ্নী। তিনি তাড়াতাড়ি সেই বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে যাহা অনুমান করিয়াছিলেন তাহাই ঠিক। হর্ষকে দেখিয়া রাজ্যশ্রী আর আত্মহত্যা করিলেন না। ভ্রাতার সহিত কান্যকুব্জে ফিরিয়া গেলেন।

তিনি রাজধানীর নিকটে থাকিয়া ভ্রাতার ধর্ম্মকর্ম্মের নানা প্রকার সাহায্য করিতে লাগিলেন।

প্রভাকর বর্দ্ধনের রাজ্য ছিল নিতান্ত ছোট। কিন্তু হর্ষ এখন থানেশ্বর ও কান্যকুব্জ দুইটি রাজ্যের রাজা হইলেন। ক্রমশঃ সমস্ত উত্তরাপথে (উত্তর ভারতে) তাঁহার অধিকার স্থাপিত হইল। কিন্তু নর্ম্মদার দক্ষিণে তিনি তাঁহার আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন নাই।



হর্ষবর্দ্ধন

কেবল দিগ্বিজয়ী বীর হইলে হয়ত এতদিনে আমরা হর্ষবর্দ্ধনের কথা ভুলিয়া যাইতাম। কিন্তু তাঁহার মত একাধারে এত গুণ সচরাচর দেখা যায় না। তিনি যেমন বড় বড় পণ্ডিতের আশ্রয়দাতা ছিলেন, নিজেও তেমনই সুলেখক ছিলেন। তাঁহার সভাপণ্ডিত বাণভট্ট কাদম্বরী ও হর্ষচরিত নামক দুইখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। হর্ষ স্বয়ং রত্নাবলী, নাগানন্দ প্রভৃতি ভাল ভাল নাটক লিখিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

হর্ষ নিজে বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তিনি কখনও অন্য ধর্ম্মের অনাদর করেন নাই। প্রত্যেক পাঁচ বৎসর অন্তর তিনি প্রয়াগে একটি উৎসবের আয়োজন করিতেন। এই সময় তাঁহার নিজের উপাস্য বুদ্ধের ন্যায় হিন্দুদিগের দেবতা শিব এবং সূর্য্যেরও পূজা হইত। তারপর তিনি তাঁহার সঞ্চিত অর্থরাশি সমাগত সাধুদিগের

মধ্যে বিতরণ করিতেন। টাকাকড়ি ফুরাইয়া গেলে বস্ত্র ও অলঙ্কার দান করিতেন, শেষে নিজের পরিধানের কাপড় পর্য্যন্ত বিলাইয়া দিয়া রাজ্যশ্রীর প্রদত্ত একখানি সামান্য কাপড় পরিতেন।

হর্ষের রাজত্বকালে হিউয়েন সাঙ (ইউয়ান চোয়াং) নামক চীন দেশের একজন পণ্ডিত ভারতবর্ষে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। বড় হইয়া তোমরা তাঁহার বই পড়িও।

সবুক্তগীন

অশোক রাজা হইবার পর সর্ব্বজীবের মঙ্গলে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। আর একজন মুসলমান রাজা সিংহাসন পাইবার পূর্ব্বেই মূকপ্রাণীর প্রতি দয়া দেখাইয়া ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম সবুক্তগীন। তিনি আগে গজনীর সুলতান আলপ্তগীনের ক্রীতদাস ছিলেন।

হর্ষবর্দ্ধন যখন উত্তর ভারতের রাজা, তখন আরবদেশে হজরত মহম্মদ একটি নূতন ধর্ম্ম প্রচার করেন। আগে আরবেরা নানা দলে বিভক্ত ছিল। তাহাদের ভিতরে বিশেষ ঐক্য ছিল না। হজরত মহম্মদের শিক্ষায় তাহারা পূর্ব্বপ্রচলিত প্রতিমা পূজা ও কুসংস্কার বর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ধর্ম্মগুরুর নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হইল। ইহার পর আরবেরা দেশে দেশে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করিতে বাহির হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সাম্রাজ্যও বাড়িতে

লাগিল। মুসলমান সেনাপতিরা একদিকে আফ্রিকার উত্তর ভাগ জয় করিয়া স্পেনে প্রবেশ করিলেন, অপরদিকে তাঁহারা ইরাণ দখল করিয়া মধ্য এশিয়ায় আপনাদের অধিকার স্থাপন করিলেন। তাঁহাদের প্রভাবে বহু তুর্কী জাতীয় লোক মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিল। মুসলমানদিগের মধ্যে জাতিভেদ নাই। সুতরাং মুসলমান হইবার পর তুর্কীরা সহজেই আরব সাম্রাজ্যে বড় বড় পদ পাইয়াছিলেন। কালক্রমে আরব সাম্রাজ্যের অবনতি আরম্ভ হইল। তখন তুর্কী সেনাপতিরা সুবিধা বুঝিয়া ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। গজনীর প্রথম স্বাধীন সুলতান আলপ্তগীন এইরূপ একটি স্বাধীন রাজ্যের কর্ম্মচারী ছিলেন, পরে মনিবের অসন্তোষের আশঙ্কা করিয়া গজনীতে আসিয়া স্বাধীন রাজা হইলেন। তিনিও প্রথমে ক্রীতদাস ছিলেন।

সেকালের মুসলমান সমাজে বড়লোকদিগের মধ্যে গোলাম কিনিবার প্রথা ছিল। মনে করিও না যে সকল গোলামই গরীব বা ছোটঘরের ছেলে। অনেকে হয়ত যুদ্ধের সময় শত্রুর হস্তে বন্দী হইয়া পরে গোলাম হইয়াছে। কিন্তু মুসলমান রাজা ও বড়লোকেরা গোলামদের প্রতি মন্দ ব্যবহার করিতেন না। তাঁহারা টাকা উপার্জ্জন ও সঞ্চয় করিতে পারিতেন, সুতরাং টাকা দিয়া মুক্তি ক্রয় করিবার সুবিধাও পাইতেন। কোন কোন ক্রীতদাস আবার মনিবের অধীনে উচ্চপদ লাভ করিতেন। এই সকল বুদ্ধিমান্ ক্রীতদাসকে ঘৃণা করা দূরে থাকুক, অনেক সময় মুসলমান সুলতানেরা ইহাদের নিকট নিজের মেয়ের বিবাহ দিতেও অপমান বোধ করেন নাই। জামাই হইয়া সেই ক্রীতদাস হয়ত শ্বশুরের সিংহাসন ও সম্পত্তি পাইয়াছে।

সবুক্তগীন ছিলেন আলপ্তগীনের গোলাম। তিনি বুদ্ধিমান্ ও বিনয়ী ছিলেন, সুতরাং গজনীর বড় বড় লোকেরা তাঁহাকে খুব ভালবাসিত এবং সুলতানের অনুগ্রহে ধীরে ধীরে তাঁহার পদোন্নতি হইতে লাগিল। সবুক্তগীনের মনটি ছিল বড়ই নরম। একদিন তিনি শিকারে গিয়া একটি হরিণছানা ধরিয়া ফেলিলেন এবং ছানাটি পুষিবার জন্য ঘোড়ার পিঠে তুলিয়া লইলেন। কিছুদূর গিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে হরিণী ছানার জন্য তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই আসিতেছে আর সজল নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিতেছে। সবুক্তগীনের বড় দয়া হইল। তিনি অবোধ পশুমাতার মমতা দেখিয়া ছানাটিকে ছাড়িয়া দিয়া আসিলেন। সেই দিন রাত্রিতে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন কে যেন তাঁহাকে বলিতেছে, সবুক্তগীন, তুমি যে অবোধ শিশুর প্রতি দয়া করিয়াছ তাহাতে ঈশ্বর তোমার প্রতি খুসী হইয়াছেন। তিনি তোমার ভাল করিবেন।

হইলও তাহাই। তিনি আলপ্তগীনের গোলাম ছিলেন, ইহার কিছুদিন পরে প্রভুর কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার জামাতা হইলেন। তারপর আলপ্তগীনের মৃত্যুর পর যখন গজনীতে অরাজকতা আরম্ভ হইল তখন সেখানকার প্রবীণ ব্যক্তিরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে সবুক্তগীনকেই রাজা করিলেন।

সবুক্তগীনের পুত্র সুলতান মামুদ দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি অনেকবার ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া বহু ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া নিয়াছিলেন। তিনি পঞ্চনদের কিয়দংশ দখল করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষে রাজ্যবিস্তারের বিশেষ চেষ্টা করেন নাই।

পৃথ্বীরাজ ও জয়চাঁদ

সুলতান মামুদের মৃত্যুর অনেক বৎসর (কিঞ্চিদধিক ১৬০ বৎসর) পরে ঘুরের রাজপুত্র মৈজুদ্দীন উত্তর ভারতে মুসলমান আধিপত্য স্থাপন করেন। সেনানায়ক হিসাবে হয়ত তিনি সুলতান মামুদের সমান ছিলেন না। কিন্তু উত্তর ভারতের বড় বড় দুইজন রাজার বিরোধে তাঁহার খুব সুবিধা হইয়াছিল।



পৃথ্বীরাজ

তখন চৌহান বংশের তৃতীয় পৃথ্বীরাজ দিল্লীর রাজা। সেকালে তাঁহার মত বীর ও সাহসী যোদ্ধা বোধ হয় রাজপুত রাজাদিগের মধ্যে আর ছিল না। এই সময় কনৌজে গাহডবাল বা রাঠোর বংশীয় জয়চাঁদ রাজত্ব করিতেন। পৃথ্বীরাজের রাজ্যের পাশেই জয়চাঁদের রাজ্য। দুইজনের মধ্যে বেজায় রেষারেষি। শেষে জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজকে অপমান করিবার একটা ফন্দি বাহির করিলেন।

রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করিয়া জয়চাঁদ তাঁহার সামন্ত রাজাদিগের সহিত পৃথ্বীরাজকেও নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইলেন। এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলে প্রকারান্তরে পৃথ্বীরাজকে জয়চাঁদের অধীনতা

স্বীকার করিতে হইত। কারণ প্রতিবেশী রাজাদিগকে যুদ্ধে অথবা আপোষে বশ্যতা স্বীকার না করাইতে পারিলে কেহ রাজসূয় যজ্ঞ করিতে পারিতেন না। পৃথ্বীরাজ যে আসিবেন না তাহা কনৌজের রাজা জানিতেন। প্রাচীন প্রথা অনুসারে সামন্ত রাজগণ যজ্ঞসংক্রান্ত বিভিন্ন কার্য্য করিতেন। জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজের এক মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া যজ্ঞমণ্ডপের প্রহরীর স্থানে রাখিয়া দিলেন।

যজ্ঞের সঙ্গে জয়চাঁদের কন্যা সংযুক্তার স্বয়ংবরেরও ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেকালে রাজকন্যারা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্য হইতে ইচ্ছামত বর বাছিয়া লইতে পারিতেন। ইহারই নাম স্বয়ংবর।

সংযুক্তাকে বিবাহ করিবার জন্য অনেক রাজাই সেই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজকুমারী তাঁহাদের কাহাকেও পছন্দ করিলেন না। তিনি দরজার কাছে গিয়া পৃথ্বীরাজের প্রতিমূর্ত্তির গলায় মালা পরাইয়া দিলেন। তখন একটা মহা হুলুস্থুল বাধিয়া গেল। পৃথ্বীরাজ লোকজন লইয়া স্বয়ংবর সভার কাছেই লুকাইয়া ছিলেন, তিনি সেই সুযোগে সংযুক্তাকে আপনার ঘোড়ায় চড়াইয়া লইয়া গেলেন।

জয়চাঁদ ইহাতে অত্যন্ত অপমান বোধ করিলেন। কথিত আছে যে তিনি এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য মৈজুদ্দীন ঘুরীকে পৃথ্বীরাজের রাজ্য আক্রমণ করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। এই অভিযোগ সত্য কিনা বলা যায় না। তবে একথা সত্য যে মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে জয়চাঁদ জামাতাকে কোন সাহায্যই করেন নাই।

মৈজুদ্দীন এই রকম সুযোগেরই অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি সসৈন্যে পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তরাইনের

প্রথম যুদ্ধে মৈজুদ্দীন দিল্লীরাজের নিকট পরাজিত হইয়া পলাইয়া গেলেন। সেবার অতিকষ্টে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হয়।

মৈজুদ্দীন একবার পরাজিত হইয়া হাল ছাড়িবার লোক ছিলেন না। একবৎসর পরেই আবার তিনি নূতন সৈন্য লইয়া ভারতে আসিলেন। আবার তরইনের যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় দলের সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু রাজপুতেরা আর জয়লাভ করিতে পারিলেন না। পৃথ্বীরাজ শত্রুর হস্তে বন্দী হইয়া প্রাণ হারাইলেন। রাণী সংযুক্তা অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।

পৃথ্বীরাজের পর জয়চাঁদের পালা। দুই বৎসর পর মৈজুদ্দীন কনৌজ আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে জয়চাঁদের পরাজয় ও মৃত্যু হইল। মুসলমানেরা কনৌজ রাজ্য দখল করিয়া লইল। দুই বৎসরের মধ্যে চৌহান ও গাহডবাল বংশের পতন হইল। ইহার পর মৈজুদ্দীনের অনুচরেরা বিহার ও বঙ্গদেশে আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিলেন। এইভাবে দিল্লীর মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

জয়চাঁদ ও পৃথ্বীরাজের বিরোধ এবং সংযুক্তার স্বয়ংবরের কাহিনী লইয়া প্রসিদ্ধ কবি চাঁদ বর্দ্দই "পৃথ্বীরাজ রাসো" নামক একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্য হিন্দী সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ।

বাদশাহ বাবর

মৈজুদ্দীন উত্তর ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, আর দিল্লীতে তৈমুরের বংশের বাদশাহী প্রতিষ্ঠিত করেন জহিরুদ্দীন মহম্মদ বাবর। বাবর ও তাঁহার বংশের সম্রাটেরা আমাদের দেশে মোগল বাদশাহ বলিয়া পরিচিত। আসলে কিন্তু তাঁহারা মোগল ছিলেন না। বাবর শব্দের অর্থ সিংহ। তিনি সিংহের মতই বলশালী ও সাহসী ছিলেন।

বাবরের পিতা মধ্য এশিয়ার ছোট একটি রাজ্যের রাজা ছিলেন। সমরখন্দের দিগ্বিজয়ী বীর তৈমুরের বংশে তাঁহার জন্ম, ওদিকে তাঁহার মাতামহ ছিলেন প্রসিদ্ধ মোগল বিজেতা চিঙ্গিস খাঁর বংশধর। বীরের বংশেই বীরের জন্ম হয়। ভয় কাহাকে বলে বাবর তাহা জানিতেন না, বাল্যকাল হইতে তিনি যুদ্ধবিগ্রহের কথা শুনিয়াছেন, যুদ্ধ করিয়াই তিনি তাঁহার জীবন কাটাইয়াছেন।

বাবরের পিতার যখন মৃত্যু হয় তখন তাঁহার বয়স এগার কি বার বৎসর। তৈমুরের বংশধরদের তখন আর পূর্ব্ব প্রতিপত্তি নাই। বিশাল সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া এক একজন সুলতান এক একটি ছোট রাজ্য পাইয়াছিলেন। পারিবারিক কলহে তাঁহারা ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। অথচ বিবাদ বিসংবাদ মিটাইবার দিকে তাঁহাদের কাহারও লক্ষ্য ছিল না, সকলেরই ইচ্ছা তৈমুরের রাজধানী সমরখন্দ দখল করিবেন।

বালক বয়সেই বাবর এই জ্ঞাতিকলহে যোগদান করিয়াছিলেন। সমরখন্দ পাইবার লোভ তাঁহারও নিতান্ত কম ছিল না। বাবর

দুই দুইবার সমরখন্দে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তৈমুরের রাজধানী নিজের দখলে রাখিতে ত পারেনই নাই, লাভের মধ্যে তাঁহার পিতৃরাজ্য ফারগাণাও হারাইয়াছিলেন। তখনকার দিনে রাজবংশের লোকেরা কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না। ভাই ভাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিত, পিতার বিরুদ্ধে পুত্র বিদ্রোহী হইত, আজ যে অনুগত বন্ধু কাল সে ভয়ানক শত্রু। বাবরের জীবনও বহুবার বিপন্ন হইয়াছে; কতবার তিনি পাহাড়ে পাহাড়ে লুকাইয়া ফিরিয়াছেন। দিনের পর দিন ঘোড়ার পিঠে কাটিয়া গিয়াছে। এক শত্রুর ভয়ে রাত্রিতে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারেন নাই। এক কথায়, অনেক দিন বাবরের মাথা রাখিবার জায়গাও ছিল না।

রাজ্য হারাইবার পর কিছুদিন বাবর এক গ্রামের মোড়লের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মোড়লের বৃদ্ধ মাতার বয়স তখন একশত এগার বৎসর। তাহার মুখে তৈমুরের হিন্দুস্থান অভিযানের কাহিনী শুনিয়া বাবরের মনেও ভারতবর্ষ জয় করিবার ইচ্ছা হয়। তখন কেহ তাঁহার মনের কথা শুনিলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিত। যে নিজে প্রাণভয়ে পলাতক সে কিনা হিন্দুস্থানের বাদশাহ হইবার স্বপ্ন দেখে!

এরকম স্বপ্ন হয়ত অনেকেই দেখে। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সেই স্বপ্ন সফল করিবার জন্য অদম্য উৎসাহ ও যত্ন কয়জনের থাকে? বাবরের ছিল, তাই তাঁহাকে আমরা এত শ্রদ্ধা করি।

অবশেষে দেশে টিঁকিতে না পারিয়া বাবর কাবুল দখল করিলেন। কাবুল হইতে তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।

তখন ইব্রাহিম লোদী দিল্লীর রাজা। সুলতান ইব্রাহিমের যত দোষই থাকুক না কেন, তিনি কাপুরুষ ছিলেন না। যুদ্ধ করিতে

তিনি কখনও ভয় পাইতেন না, কিন্তু কেবল সাহস থাকিলে যুদ্ধে জয়লাভ করা যায় না, তাহার জন্য বুদ্ধিরও প্রয়োজন। বাবর ছেলেবেলা হইতে অনেক যুদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং বার হাজার সৈন্য লইয়া তিনি ইব্রাহিমের এক লক্ষ সৈন্যের সম্মুখীন হইতেও ভয় পাইলেন না। বাবরের সেনাপতিরা সকলেই বহু যুদ্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, আর তাঁহার সঙ্গে কতকগুলি কামান ছিল। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি দিল্লী ও আগ্রা দখল করিলেন।

পাঠান রাজার পরাজয়ের পর আবার একজন হিন্দুবীরের সহিত বাবরের যুদ্ধ হইয়াছিল। মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহ মনে করিয়াছিলেন যে তৈমুরের মত বাবরও দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া ফিরিয়া যাইবেন, আর পাঠান সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর তিনি একটি নূতন হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিবেন। কিন্তু তিনি যখন দেখিলেন ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা বাবরের মোটেই নাই, তখন তিনি যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। প্রথম একটা যুদ্ধে রাজপুতদিগেরই জয় হইয়াছিল।

রাণা সংগ্রাম সিংহ মস্ত বীর। তিনি মালবের মুসলমান রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। রাজপুতানার অনেক রাজাই তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিল। সুতরাং বাবরের অনুচরেরা এবার অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিল। বাবর কিন্তু কিছুতেই দমিলেন না। তিনি ভগবানের কাছে একাগ্রমনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ভগবানের অনুগ্রহ লাভের জন্য তিনি সুরাপান পরিত্যাগ করিলেন। পাছে তাঁহার সৈন্যগণের মন খারাপ হইয়া যায় এইজন্য তিনি তাহাদিগকে বলিলেন যে, ইচ্ছা হইলে তাহারা দেশে ফিরিয়া যাইতে পারে।

শেষে খানুয়ার যুদ্ধে বাবরেরই জয় হইল। বর্শা ও তরবারি লইয়া রাজপুত সেনা বাবরের কামানের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিল না।



বাদশাহ বাবর তাঁহার আত্মচরিত লিখাইতেছেন (প্রাচীন চিত্র হইতে)

কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা রাজপুত জাতির পক্ষে বড় লজ্জার কথা। তাই হাজার হাজার রাজপুত এই যুদ্ধে মরিয়াছিল।

এই পরাজয়ের পর রাণা সঙ্গ বেশী দিন বাঁচেন নাই। ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালা দেশের পশ্চিম সীমানা পর্য্যন্ত বাবরের অধিকার বিস্তৃত হইল। তিনি হিন্দুস্থানের বাদশাহ হইলেন।

তাঁহার মৃত্যুর সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। বাবর তাঁহার সন্তানদিগকে বড়ই স্নেহ করিতেন, প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বাসিতেন। জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুনের সেবার বড়ই কঠিন ব্যারাম হইয়াছিল। চিকিৎসকেরা তাহার জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বাবর পুত্রের জন্য বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার একজন বন্ধু বলিলেন যে এরূপ অবস্থায় ভগবানের নিকট কোন প্রিয় দ্রব্য নিবেদন করিলে পীড়িত পুত্রের প্রাণরক্ষা হইতে পারে। আপনি ভগবানের নামে মণিমুক্তা জহরত বিতরণ করুন। বাদশাহ উত্তর করিলেন, মণিমুক্তা জহরত অপেক্ষাও আমার প্রাণ অধিক প্রিয়। হুমায়ুনের প্রাণের বদলে আমার নিজের প্রাণ দিব। তারপর তিনি স্নান করিয়া শুদ্ধ মনে রোগীর কক্ষে বসিয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন—হে আল্লা, আমার প্রাণ লইয়া তুমি হুমায়ুনের প্রাণ বাঁচাও। ভগবান্ পিতার কাতর প্রার্থনা শুনিলেন। হুমায়ুন ধীরে ধীরে ভাল হইয়া উঠিলেন, আর বাবরের স্বাস্থ্য ক্রমশঃই খারাপ হইতে লাগিল। পুত্রের আরোগ্য লাভের কয়েক মাস পরেই পিতার মৃত্যু হইল।

বাবর সুকবি ও সুলেখক ছিলেন। তাঁহার আত্মচরিত অনেক ভাষায় অনুবাদ হইয়াছে। দিগ্বিজয়ী বীর না হইলেও বাবরের নাম সুকবি ও সুলেখক হিসাবে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিত।

গুরু নানক

তোমরা নিশ্চয় শিখদিগের নাম শুনিয়াছ। সংখ্যায় খুব কম হইলেও শিখেরা এক সময় পঞ্জাব ও কাশ্মীর জয় করিয়া একটি বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। এখনও ভারত সরকারের সেনাদলে শিখদের খুব আদর। শিখ শব্দের অর্থ শিষ্য। এই সম্প্রদায়ের প্রথম গুরু বাবা নানক।

নানক জাতিতে ক্ষত্রিয়। ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবের তালবন্দী গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। এই গ্রামকে এখন নানকানা বলে। নানকের পিতা গ্রামের হিসাব লিখিতেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল না হইলেও গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধা করিত।

প্রথম হইতেই নানকের সংসারে মন ছিল না। তিনি সাধু সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করিতেই ভালবাসিতেন। একাকী অনেক সময় ভগবানের চিন্তা করিতেন। তাঁহার পিতা অবশ্য নানকের মন ফিরাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু টাকা কড়ি রোজগারের দিকে নানকের একটুও উৎসাহ দেখা গেল না। বরং তাঁহার মনের গতি ক্রমশঃই বিপরীত দিকে যাইতে লাগিল। একবার পিতা নানককে ব্যবসায় করিতে কিছু টাকা দিয়াছিলেন। নানক মালপত্র কিনিতে চলিয়াছেন। পথে দেখা কয়েকজন সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গে। মালপত্র কেনা আর হইল না। সাধু সন্ন্যাসীদের খাওয়াইয়া নানক সমস্ত টাকা খরচ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহাকে খালি হাতে বাড়ীতে ফিরিতে দেখিয়া তাঁহার বাবা রাগিয়া গেলেন।

কিন্তু ছেলের উপর রাগ করিয়াও কোন ফল হইল না। যে মূলধন খরচ হইয়া গিয়াছে তাহাত আর ফিরিবে না।

নানকের বিবাহ হইয়াছিল। দুইটি পুত্রও হইয়াছিল। কিন্তু ঘরে তাঁহার মন টিকিল না। তিনি নানাদেশে তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন। সেকালে এখনকার মত রেল ষ্টীমার হয় নাই। ভাল পথ ঘাটও ছিল না। সুতরাং তীর্থভ্রমণে কষ্ট হইত খুবই। নানক এই সকল কষ্ট গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি ভারতবর্ষের বাহিরে মুসলমানদিগের মহাতীর্থ মক্কায় গিয়াছিলেন। সকল ধর্ম্মের প্রতিই তাঁহার সমান শ্রদ্ধা ছিল। সকল সম্প্রদায়ের সাধুদিগকেই তিনি সমান ভক্তি করিতেন।



নানক

তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে সকল ধর্ম্মেরই মূলতত্ত্ব এক। হিন্দুরা যে ভগবানের পূজা করে মুসলমানেরাও তাঁহারই উপাসনা করে। অতএব ধর্ম্মমত লইয়া কলহ বিবাদের কোনই প্রয়োজন নাই। ভগবান্ সকল সম্প্রদায়ের মানুষকেই সমান স্নেহ করেন। এক কথায়, ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন প্রকার গোঁড়ামি তিনি ভালবাসিতেন না।

তিনি সরলভাবে বিশ্বাস করিতেন যে ঈশ্বর পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আছেন। একটি গল্প আছে যে মক্কায় তীর্থ করিতে গিয়া তিনি

একদিন বিখ্যাত কাবার দিকে পা দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। একজন মোল্লা তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন। ভগবানের পবিত্র মন্দিরের দিকে পা দিয়া শোয় এমন আহাম্মকও নাকি আবার তীর্থ করিতে আসে! মোল্লা তখনই নানককে ধাক্কা দিয়া জাগাইয়া দিলেন, আর বহু তিরস্কার করিতে লাগিলেন। নানক চুপ করিয়া মোল্লার কথা শুনিয়া গেলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন—মোল্লা সাহেব, বলিতে পারেন ঈশ্বর কোন দিকে নাই? এখন হইতে সেইদিকেই পা দিয়া শুইব। না হয় আপনিই সেই দিকে আমার পা দুটা ঘুরাইয়া দিন। মোল্লা তখন নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন।

তাঁহার সরল ধর্ম্মমতে আকৃষ্ট হইয়া হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বহু লোক নানকের শিষ্য হইয়াছিল। নানক ছিলেন নিতান্ত শান্তিপ্রিয় নিরীহ সাধু। তাঁহার সময়ে শিখেরা যুদ্ধ-বিগ্রহের ধার দিয়াও যাইত না। নানকের মৃত্যুর অনেক পরে নানা কারণে তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায় এক পরাক্রান্ত যোদ্ধার জাতিতে পরিণত হইয়াছিল।

অনেক বয়সে ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে নানকের মৃত্যু হয়।

নানক নিজের পুত্রদিগকে গুরুর পদ দেন নাই। মৃত্যুকালে তিনি প্রিয়শিষ্য অঙ্গদকে শিখ সম্প্রদায়ের গুরু নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। তারপর কেমন করিয়া শিখেরা দিল্লীর বাদশাহের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, কেমন করিয়া রণজিৎ সিংহের অধীনে তাহারা মস্ত একটা সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, কেমন করিয়া সেই সাম্রাজ্যের পতন হইল, তাহা তোমরা বড় হইয়া পড়িও।

আকবর

আকবর বাবরের পৌত্র। বাবর বিদেশী, আকবরের জন্ম হইয়াছিল ভারতবর্ষের মাটিতে। হিন্দুস্থানের সাধারণ প্রজারা বাবরকে কি চক্ষে দেখিত তাহা আমরা জানি না, কিন্তু আকবরকে সকলেই ভালবাসিত ও ভক্তি করিত। হিন্দুরা দিল্লীশ্বরকে জগদীশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়াই মনে করিত।

বাবরের মত আকবরও অনেক দুঃখ কষ্ট বিপদ আপদের মধ্যে মানুষ হইয়াছিলেন। বাবরের পুত্র হুমায়ুন পিতার সিংহাসন রক্ষা করিতে পারেন নাই। পাঠান বীর শেরশাহ তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন। রাজ্যচ্যুত হুমায়ুন যখন আশ্রয়ের জন্য এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন তখন সিন্ধুর মরুভূমির মধ্যে অমরকোটে আকবরের জন্ম হয়। পুত্রের জন্ম-সংবাদ পাইয়া যে একটু আমোদ আহ্লাদ করিবেন এমন সম্পত্তি তখন হুমায়ুনের ছিল না। তিনি তাঁহার বিপদের সাথীদিগের মধ্যে একটু কস্তুরী বিতরণ করিয়া বলিয়াছিলেন, আশীর্ব্বাদ করিও এই বালকের যশ যেন একদিন কস্তুরীর মতই চারিদিকে বিস্তৃত হয়।

আকবরের শিশুকাল কাটিয়াছিল এক পিতৃব্যের আশ্রয়ে। পিতার সহিত পিতৃব্যের সদ্ভাব ছিল না। সুতরাং আকবর তাহার নিকট আদরযত্ন পান নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে হুমায়ুন দিল্লী অধিকার করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু তাঁহার শত্রুরা তখনও নির্ম্মূল হয় নাই। পিতার মৃত্যুসময়ে আকবরের বয়স ছিল মাত্র তের বৎসর। বাল্যকাল হইতেই আকবর সাহস ও যুদ্ধপ্রিয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন। বড় হইয়া তাঁহার প্রথম কাজ হইল রাজ্যবিস্তার।

উত্তর ভারতের প্রায় সমস্ত প্রদেশেই তাঁহার আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। রাজপুতানার অনেক রাজা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার



হুমায়ুন (শিল্পী ভগবতী)

করিয়াছিলেন। দক্ষিণেও তিনি খান্দেশ ও আহ্মদনগরের কিয়দংশ জয় করিয়াছিলেন। এক কথায়, আকবর হিন্দুস্থানের একচ্ছত্র সম্রাট্ হইয়াছিলেন।

অন্য বাদশাহের সঙ্গে আকবরের এক বিষয়ে মস্ত প্রভেদ ছিল। তিনি বাহুবলে রাজ্য জয় করিতেন ; তারপর বিজিত রাজাদিগকে



বাদশাহ আকবর (শাহজাহানের সময়ের চিত্র)

সদ্ব্যবহারের দ্বারা বন্ধু করিয়া লইতেন। রাজপুত রাজাদিগের কয়েকজনের সঙ্গে তিনি কুটুম্বিতা করিয়াছিলেন। তিনি নিজে

রাজপুতের মেয়ে বিবাহ করিয়াছিলেন। পুত্র সেলিমের সঙ্গেও এক রাজপুত রাজকুমারীর বিবাহ দিয়াছিলেন।

হিন্দু মুসলমানে যাহাতে অসদ্ভাব না হয় সেদিকে আকবরের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। হিন্দুদিগের নিকট মুসলমান রাজারা আগে "জিজিয়া" নামক একটা কর আদায় করিতেন। আকবর এই কর উঠাইয়া দেওয়ায় হিন্দুরা খুব খুসী হইয়াছিল। আবার তিনি তাহাদিগকে রাজ-সরকারে বড় বড় চাকরী দিতে লাগিলেন। জয়পুরের রাজা মানসিংহ আকবরের আমলে সেনাপতির পদ পাইয়াছিলেন। টোডরমল নামক আর একজন হিন্দু তখন সুবাদার বা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। এই টোডরমল কেবল যে বড় যোদ্ধা ছিলেন তাহা নহে। সেকালে রাজস্বের হিসাব তাঁহার মত আর কেহই বুঝিত না। তিনিই জমি জরিপ করিয়া আকবরের রাজ্যে রাজস্বের হার ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। বীরবল নামক একজন ব্রাহ্মণকে আকবর বড়ই ভাল বাসিতেন। বীরবল কবিতা রচনা করিতে পারিতেন, হাস্য কৌতুকেও তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। হিন্দু রাজারা আকবরের সাম্রাজ্যের উন্নতির জন্য মুসলমান সেনাপতিদিগের মতই পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

আকবরের অসাধারণ শারীরিক শক্তির অনেক গল্প আছে। অনেকবার তিনি ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বড় বড় নদী পার হইয়া গিয়াছেন। শিকার করিতে তিনি খুবই ভালবাসিতেন। বড় বড় হিংস্র জন্তুর মুখে পড়িয়াও তিনি কোন দিন ভয় পান নাই। একবার একজন উদ্ধত কর্ম্মচারীকে তিনি এক ঘুসিতেই কাবু করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

আকবর লিখিতে পড়িতে শেখেন নাই। অক্ষর পরিচয় অপেক্ষা অস্ত্রচালনা শেখাই তাঁহার বেশী দরকার ছিল। কিন্তু মনে করিও না যে নিরক্ষর বলিয়া তিনি মূর্খ ছিলেন। বড় বড়



আকবর—অশ্বারোহণে শিকার করিতেছেন

পণ্ডিতেরা তাঁহাকে পুঁথি পড়িয়া শুনাইতেন। বাদশাহের স্মরণশক্তি এমন প্রখর ছিল যে একবার যাহা শুনিতেন তাহা আর ভুলিতেন না। হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খ্রীষ্টান ও জৈন সম্প্রদায়ের পুরোহিত ও সাধুরা আকবরের নিকট শাস্ত্র আলোচনা

করিতেন। বিক্রমাদিত্যের মত আকবরেরও একটি নবরত্ন সভা ছিল। মানসিংহ, টোডরমল, আবুল ফজল, ফৈজী, তানসেন প্রভৃতি এই সভার অলঙ্কার ছিলেন।

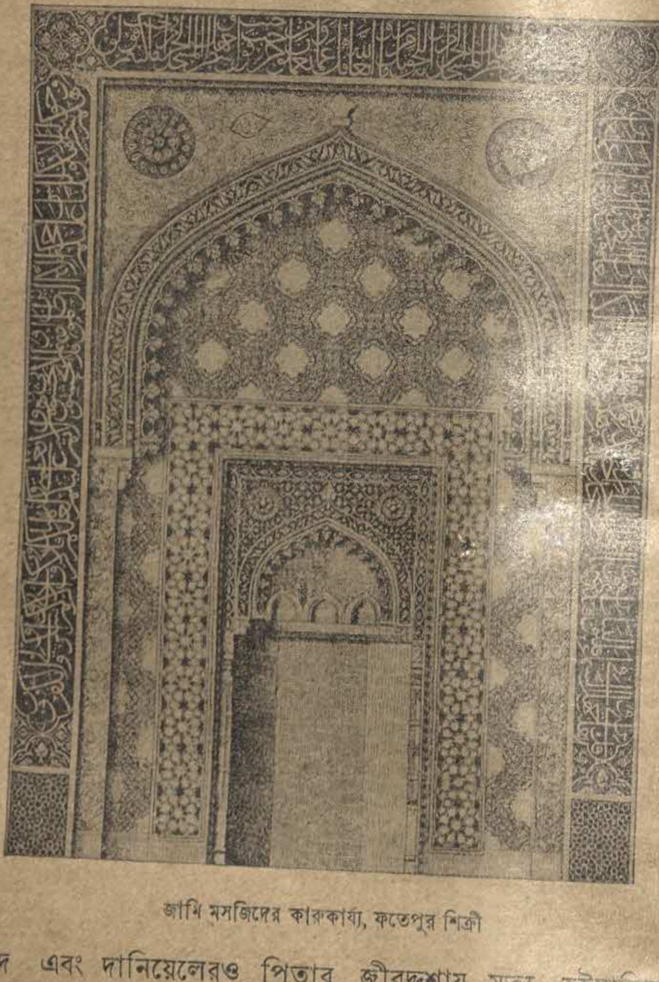
আবুল ফজল ও ফৈজী সহোদর ভ্রাতা। ইহাদের দুইজনকেই বাদশাহ খুব আদর করিতেন। আবুল ফজলের পারস্য ভাষায় খুব দখল ছিল। তিনি "আইন-ই আকবরী" ও "আকবর নামা" নামক দুইখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এই দুইখানি বই একালের ঐতিহাসিকদের নিকটও সমাদর লাভ করিয়াছে। ফৈজী ছিলেন কবি। তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া বাদশাহের আদেশে কয়েকখানি ভাল ভাল সংস্কৃত গ্রন্থ পারস্য ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। তানসেনের মত গানের ওস্তাদ ভারতবর্ষে আর জন্মগ্রহণ করে নাই।



আবুল ফজল

ধর্ম্মমতেও আকবর খুব উদার ছিলেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের মূল নীতি লইয়া একটি নূতন মত প্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রজারা এই মত গ্রহণ করিলে বোধ হয় হিন্দু মুসলমানের বিবাদ বিসংবাদ চিরকালের জন্য মিটিয়া যাইত। কিন্তু কেহই সহসা পিতামহের ধর্ম্ম ছাড়িতে চাহে না। আর আকবর কাহাকেও জোর করিয়া নিজের ধর্ম্মমত গ্রহণ করাইবার পক্ষপাতী ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার আশ্রিত ও অনুগৃহীতদিগের মধ্যেও বেশী লোক নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই। আকবরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম লোপ পাইয়াছে।

শেষ বয়সে আকবর অনেক মনঃকষ্ট পাইয়াছেন। বন্ধু বীরবলের মৃত্যুতে তিনি খুবই দুঃখ পাইয়াছিলেন। রাজকুমার



জামি মসজিদের কারুকার্য্য, ফতেপুর শিক্রী

মুরাদ এবং দানিয়েলেরও পিতার জীবদ্দশায় মৃত্যু হইয়াছিল বাঁচিয়া রহিলেন কেবল সেলিম, শেষকালে তিনিও পিতার অবাধ্য

হইলেন। সেলিমের চক্রান্তে আকবরের প্রিয় সুহৃদ্ আবুল ফজল নিহত হইলেন। কিন্তু এত দুঃখের মধ্যেও বাদশাহ তাঁহার স্বাভাবিক ধৈর্য্য ও সাহস হারান নাই।

আকবর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলেই ইংরেজরা ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিয়া সুরাটে কুঠী স্থাপন করেন। এই সময়ে ভারতীয় শিল্পেরও খুব উন্নতি হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান শিল্পীদিগের সাহায্যে আকবর ফতেপুর-শিক্রীতে যে সকল প্রাসাদ ও মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এত দিনের অযত্নেও তাহার সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় নাই। এখনও দেশ বিদেশ হইতে অনেক পর্য্যটক এই জনহীন নগরের প্রাসাদ ও ভজনালয়গুলি দেখিতে আসেন।

রাণা প্রতাপ

সম্রাট্ আকবর সমস্ত হিন্দুস্থানের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজপুতানার একটি সামান্য জনপদের রাজাকে কোনমতেই আনুগত্য স্বীকার করাইতে পারেন নাই। অম্বর ও মাড়োয়ারের রাজপুত রাজারা বাদশাহের সহিত কুটুম্বিতা করিলেন, কিন্তু মেবারের রাণা প্রতাপ সিংহ কিছুতেই আকবরের নিকট মাথা নত করিলেন না।

প্রতাপ সিংহ মেবারের বিখ্যাত রাণা সংগ্রাম সিংহের পৌত্র। খানুয়ার যুদ্ধের পরই মেবারের প্রতিপত্তি কমিয়া গিয়াছিল। তারপর গুজরাটের মুসলমান সুলতানের আক্রমণে মেবারের রাণা আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। শেষে পুণ্যবতী পান্না নিজের পুত্রের

প্রাণ দিয়া রাণা সঙ্গের যে শিশুপুত্রকে বাঁচাইয়াছিলেন সেই উদয় সিংহ চিতোরের সিংহাসনে বসিলেন। উদয় সিংহ বীর পিতার অযোগ্য পুত্র। তিনি চাহিতেন আরাম করিয়া কোন রকমে সময় কাটাইয়া দিতে। রাজপুতানার অন্য রাজাদের মত তিনি দিল্লীর বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই, অথবা আকবরের পরিবারে কন্যা বিবাহ দিয়া কুটুম্বিতা করেন নাই। কিন্তু আকবর তাঁহার রাজধানী আক্রমণ করিবামাত্র উদয় সিংহ চিতোর ছাড়িয়া পলাইয়া গেলেন। চিতোর রক্ষার ভার পড়িল সেনাপতি জয়মল্লের উপর। জয়মল্ল, পুত্ত প্রভৃতি বীরপুরুষেরা প্রাণ দিয়াও চিতোর রক্ষা করিতে পারিলেন না। মেবারের রাজধানী আকবরের অধিকারে গেল।

উদয় সিংহের মৃত্যুর পর মেবারের রাণা হইলেন তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপ সিংহ। প্রতাপ সিংহ প্রথম হইতেই স্থির করিয়াছিলেন যে তিনি কিছুতেই বাদশাহের অধীন হইবেন না, যে সকল রাজপুত রাজা আকবরের সহিত কুটুম্বিতা করিয়াছেন তাহাদের সঙ্গেও সম্পর্ক রাখিবেন না। এক গল্প আছে যে প্রতাপসিংহ মানসিংহের সহিত আহার করিতে অসম্মত হওয়ায় তাহার অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য আকবর মেবার আক্রমণ করেন। এই গল্প কতদূর সত্য বলা যায় না। অতিথিকে অপমান করা রাজপুতের ধর্ম্ম নহে। আকবর উদয়সিংহের আমলেই ত মেবার আক্রমণ করিয়াছিলেন। প্রতাপ কিছু না করিলেও কি বাদশাহ চুপ করিয়া থাকিতেন?

বাদশাহের সঙ্গে প্রতাপ সিংহ যুদ্ধে পারিবেন কেন? তাঁহার সৈন্য কম, টাকা কম, রাজ্যও ছোট। কিন্তু বীরত্বে ও সাহসে

প্রতাপ কাহারও অপেক্ষা ছোট ছিলেন না। হল্‌দিঘাট বা গোগুণ্ডার যুদ্ধে বাদশাহী সৈন্যের নিকট তিনি পরাজিত হইলেন। এই যুদ্ধে বোধ হয় তাঁহার প্রাণও বাঁচিত না। আকবরের সৈন্যেরা যখন প্রতাপ সিংহকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে তখন মান্না নামক তাঁহার একজন সর্দ্দার রাজচিহ্ন ধারণ করিয়া শত্রুসৈন্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। মান্নার চেহারা ছিল অনেকটা প্রতাপ সিংহের মত। রাণা মনে করিয়া বাদশাহের সৈন্যেরা তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সেই সুযোগে প্রতাপ সিংহের অনুচরেরা কোন গতিকে রাণাকে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িল।


রাণা প্রতাপসিংহ

একে একে মেবারের প্রায় সকল কেল্লাই আকবরের সেনাপতিরা দখল করিলেন। প্রতাপ সিংহ কোনমতে বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্ব্বতে লুকাইয়া লুকাইয়া ফিরিতে লাগিলেন। সকল দিন তাঁহার ও তাঁহার শিশু পুত্র-কন্যার আহারও জুটে নাই। বিশ্রামের অবসর তাঁহার মোটেই ছিল না ; কখন বাদশাহের ফৌজ আসিয়া পড়িবে তাহার ঠিক নাই, তাই প্রতাপ ও তাঁহার অনুচরেরা দিবারাত্র সতর্ক হইয়া থাকিতেন। এত কষ্টেও কিন্তু প্রতাপ সিংহের প্রতিজ্ঞা

টলিল না। স্বদেশের সম্মান তিনি নিজের সুবিধার জন্য নষ্ট হইতে দিবেন না, মেবারের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া তিনি নিরাপদে থাকিতে চাহেন না। তাঁহার এই অটল প্রতিজ্ঞা ও অসম সাহস দেখিয়া আকবরের কর্ম্মচারীরাও বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই।

শেষে প্রতাপ সিংহের এক মন্ত্রী তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ রাণাকে দান করিলেন। প্রতাপ আবার নবীন উৎসাহে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি অনেকগুলি দুর্গই দখল করিলেন, কিন্তু চিতোর বাদশাহের হাতেই রহিয়া গেল; প্রতাপ সিংহ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে চিতোর উদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি বিছানায় শুইবেন না, গাছের পাতায় আহার করিবেন। মৃত্যুসময়ও তিনি দেশের কথা ভুলিতে পারেন নাই; মেবারের সর্দ্দারদিগকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, তোমরা আমার সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা কর যে আমার মৃত্যুর পর মেবারের স্বাধীনতা নষ্ট হইতে দিবে না। নহিলে আমি শান্তিতে মরিতে পারিতেছি না।

ভারতবর্ষে অনেক বীরের জন্ম হইয়াছে, কিন্তু প্রতাপ সিংহের মত স্বদেশের জন্য এমন সর্ব্বস্বত্যাগ করিতে কয়জন পরিয়াছে?

রাণী দুর্গাবতী

কেবল যে প্রতাপ সিংহই আকবরের রাজ্যবিস্তারে বাধা দিয়াছিলেন তাহা নহে, বঙ্গদেশের পাঠান বীরেরাও বাদশাহের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। গড়ার রাণী দুর্গাবতী ও আহ্‌মদনগরের রাজকন্যা চাঁদ সুলতানাও নিজের দেশ রক্ষার জন্য অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

মধ্যপ্রদেশের উত্তর ভাগে গড়া রাজ্য। জব্বলপুরের কাছে এই রাজ্যের রাজধানী। মধ্যপ্রদেশের আদিম অধিবাসীদিগকে গোণ্ড বলে। গোণ্ডরাজ সংগ্রাম শাহের সময় গড়া রাজ্যের খুব উন্নতি হইয়াছিল। দুর্গাবতী তাঁহার পুত্রবধূ। অল্প বয়সে দুর্গাবতীর স্বামী দলপতের মৃত্যু হয়। তারপর তিনি প্রায় পনর বৎসর শিশুপুত্রের নামে রাজ্য শাসন করেন। তাঁহাকে প্রজারা মায়ের ন্যায় ভালবাসিত, তিনিও তাহাদিগকে সন্তানের মত স্নেহ করিতেন।



রাণী দুর্গাবতীর সমাধি

ছেলে বড় হইয়াছে। তাহার হাতে শাসনের ভার দিয়া দুর্গাবতী নিশ্চিন্ত হইবেন, এমন সময় আকবরের সেনাপতি

আসফ খাঁর দৃষ্টি এই ছোট গোণ্ডরাজ্যটির উপর পড়িল। দুর্গাবতী রাজপুতের মেয়ে। তিনি শত্রুর হাতে বিনাযুদ্ধে স্বামী ও পুত্রের রাজ্য ছাড়িয়া দিলেন না। কিন্তু তাঁহার গোণ্ড অনুচরেরা আসফ খাঁর সুশিক্ষিত সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে পারিবে কেন? দুর্গাবতী নিজে হাতীর পিঠে চড়িয়া অসম সাহসে আসফ খাঁর সহিত যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্যেরা হারিয়া গেল। শত্রুর তীরে তিনি আহত হইয়াছিলেন, সুতরাং পলায়ন ভিন্ন তাঁহার উপায় ছিল না। হঠাৎ নদীতে বন্যা আসিয়া তাঁহার পলায়নের পথও বন্ধ হইল। শেষে কি গড়ার রাণী মোগলের হস্তে বন্দী হইবেন? রাজপুতের কাছে মানের চেয়ে প্রাণ বড় নয়। দুর্গাবতী আত্মহত্যা করিলেন প্রাণ দিয়া মান বাঁচাইলেন।

এই ভাবে বন্য গোণ্ডজাতির ছোট একটা রাজ্যের রাণীর নাম ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল। এখনও মধ্য প্রদেশের গ্রামে নগরে দুর্গাবতীর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। জব্বলপুর সহর হইতে দশ মাইল দূরে রাণী দুর্গাবতীর সমাধি আছে।

চাঁদ সুলতানা

চাঁদ সুলতানা আহ্‌মদনগরের মুসলমান রাজবংশের কন্যা। তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল বিজাপুরের আলি আদিল শাহের সহিত। বিধবা হইবার পর চাঁদবিবি কিছুদিন শিশু সুলতানের নামে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে বিজাপুরে তাঁহার আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রতিপত্তি রহিল না। তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

এমন সময় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের রাজ্য আহ্‌মদনগরে ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইল। সুলতানদিগের পারিবারিক কলহে আহ্‌মদনগরে শান্তি ছিল না। মন্ত্রী ও রাজকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে দলাদলি ও কলহের অভাব ছিল না। শেষে একদল আর এক দলকে জব্দ করিবার জন্য আকবরের পুত্র শাহজাদা মুরাদকে আহ্বান করিল। মুরাদ ত্রিশ হাজার সৈন্য লইয়া আহ্‌মদনগর আক্রমণ করিলেন, তখন তাঁহাদের হুঁস হইল যে কাজটা ভাল হয় নাই। কিন্তু এই সঙ্কটে কে নাবালক রাজার রাজ্য রক্ষা করিবে? তখন চাঁদ সুলতানার কথা সকলের মনে পড়িল।

এই সময় চাঁদবিবির বয়স পঞ্চাশের কম নহে। কিন্তু পিতা পিতামহের রাজ্য নষ্ট হইবে, আর তিনি চুপ করিয়া থাকিবেন? খবর পাইবামাত্র তিনি আহ্‌মদনগরে আসিলেন। সেবার তাঁহারই বীরত্বে আহ্‌মদনগর রক্ষা পাইল। বাদশাহী ফৌজ হাজার চেষ্টা করিয়াও নগর দখল করিতে পারিল না। আহ্‌মদনগরের কর্ম্মচারীরা যদি ইহার পর আত্মকলহ ভুলিয়া

যাইত তাহা হইলে বোধ হয় আর তাহাদের কোন বিপদ নাও হইতে পারিত। কিন্তু আকবরের সৈন্য চলিয়া যাইবার পরই তাহারা আবার ঝগড়া বিবাদ আরম্ভ করিল। শেষে চাঁদবিবির উপর বিরক্ত হইয়া এই নির্ব্বোধেরা তাঁহাকেই হত্যা করিল। বাদশাহও অনায়াসে আহ্‌মদনগর ও আসিরগড় প্রভৃতি বড় বড় দুর্গ দখল করিয়া লইলেন।

চাঁদবিবি ও দুর্গাবতীর মত বীর নারী সকল দেশেই বিরল।

বাদশাহ জাহাঙ্গীর

আকবরের পর সেলিম দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিলেন। বাদশাহ হইবার পর তাঁহার নাম হইল জাহাঙ্গীর। জাহাঙ্গীর বাপের আদরের ছেলে, বাপের মত বাল্যকালে তাঁহাকে দুঃখ কষ্ট পাইতে হয় নাই। তাই তিনি একটু বিলাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন, আয়েস আরাম ভালবাসিতেন।

বাদশাহ হইয়া তিনি স্থির করিলেন যে রাজ্যের মধ্যে সুবিচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই জন্য তিনি তাঁহার প্রাসাদের বাহিরে মস্ত বড় একটা শিকল ঝুলাইয়া দিলেন। এই শিকলে ষাটটা ঘণ্টা বাঁধা ছিল। শিকল টানিলেই ঘণ্টাগুলি বাজিয়া উঠিত। কাহারও কোন অভিযোগ থাকিলে এই শিকল টানিয়া বাদশাহকে জানাইতে পারিত। পিতার ন্যায় জাহাঙ্গীরও তাঁহার হিন্দু প্রজাদিগের প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার আমলেও হিন্দুরা বড় বড় চাকুরী পাইয়াছে।

বাদশাহ হইবার কয়েক বৎসর পরে জাহাঙ্গীর মেহের উন্নিসা নাম্নী এক পরম রূপবতী মহিলাকে বিবাহ করেন। মেহেরের পিতা



সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের আতর উৎসব

আকবরের আমলে ইরাণ দেশ হইতে দিল্লীতে আসিয়াছিলেন। বাদশাহের অনুগ্রহে তাহার ক্রমশঃ উন্নতি হইতে লাগিল। কেহ কেহ বলেন যে ঐই সময়েই মেহেরের রূপ দেখিয়া যুবরাজ সেলিম তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন। যাহা হউক, শের আফগান নামক একজন সৈনিক কর্ম্মচারীর সহিত মেহেরের বিবাহ হয়। শের আফগান বর্দ্ধমানে জায়গীর পাইয়াছিলেন।



নুরজাহান

এইখানে বাঙ্গালার সুবাদার কুতবুদ্দীনখাঁর সহিত তাঁহার কোন কারণে বিবাদ হয়। এই বিবাদের ফলে শের আফগানের হস্তে সুবাদার নিহত হইলেন, আর তাঁহার সঙ্গিগণ শের আফগানকে কাটিয়া ফেলিল। বিধবা মেহের একমাত্র শিশু কন্যা লইয়া রাজধানীতে গেলেন। চারি বৎসর পরে বাদশাহের সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। বিবাহের পর জাহাঙ্গীর আদর করিয়া মেহেরের নাম রাখিলেন নুরজাহান। নুরজাহান অর্থ "জগতের আলো"। ইতিহাসে মেহের উন্নিসা সম্রাজ্ঞী নুরজাহান নামেই প্রসিদ্ধ।

নুরজাহানের যে কেবল রূপ ছিল তাহা নহে, তাঁহার বুদ্ধিও ছিল অসাধারণ। সুতরাং বিলাসী সম্রাট্ ক্রমে ক্রমে সমস্ত রাজকার্য্য নুরজাহানের হাতে ছাড়িয়া দিয়া আলস্যে কাল কাটাইতে লাগিলেন। বাদশাহের দরবারে নুরজাহানের পিতা ও

আত্মীয়গণের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইল। বাদশাহের তৃতীয় পুত্র খুর্‌রম নুরজাহানের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করিয়া নিজের উন্নতির সুবিধা করিয়া লইলেন। কিন্তু শেষে মেহের উন্নিসার নিজের মেয়ের সহিত বাদশাহের ছোট ছেলে শাহরিয়রের বিবাহ হইল। শাহরিয়রের বুদ্ধি শুদ্ধি বিশেষ ছিল না। কিন্তু হইলে হইবে কি, সম্রাজ্ঞী নুরজাহান নিজের মেয়ে ও জামাইকে সিংহাসন দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। খুর্‌রম অসন্তুষ্ট হইয়া পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলেন।

খুর্‌রম পূর্ব্বে অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। কিন্তু বাদশাহী ফৌজের সহিত তিনি যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিলেন না। যুদ্ধে হারিয়া তিনি দক্ষিণাপথ হইতে বঙ্গে এবং বঙ্গদেশ হইতে দক্ষিণাপথে পলাইয়া ফিরিতে লাগিলেন।

এই যুদ্ধে বাদশাহের সেনাপতি মহব্বৎ খাঁ বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। মহব্বৎ খাঁ জাতিতে আফগান; জাহাঙ্গীরের বাদশাহ হইবার সময় তিনি মাত্র পাঁচশত সৈন্যের সেনাপতি ছিলেন। কিন্তু বাদশাহের কৃপায় তাঁহার ক্রমশঃই উন্নতি হইতে লাগিল। খুর্‌রমকে পরাজয় করিয়া বাদশাহের দরবারে তাঁহার প্রতিপত্তি অতিশয় বাড়িয়াছিল। সুতরাং নুরজাহান তাঁহার প্রতি বিরূপ হইলেন।

মহব্বৎ খাঁ সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি কাবুলের পথে ঝিলাম নদী পার হইবার সময় হঠাৎ সম্রাটের শিবির ঘিরিয়া ফেলিলেন। জাহাঙ্গীরকে কোন প্রকারে অসম্মান না দেখাইলেও কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না যে, বাদশাহ প্রকৃতপক্ষে মহব্বতের হস্তে বন্দী হইয়াছেন। সম্রাজ্ঞী নুরজাহান তখন নদীর অপর

পারে। অন্য কোন নারী স্বামীর এই প্রকার বিপদ দেখিলে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িতেন। কিন্তু নুরজাহানের যেমন বুদ্ধি তেমনই সাহস। তিনি যুদ্ধ করিয়া সম্রাট্‌কে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিলেন। সম্রাজ্ঞী নিজে শাহরিয়রের শিশু কন্যাকে কোলে করিয়া এই যুদ্ধে যোগ দিলেন, কিন্তু মহব্বতের হস্তে তাঁহার পরাজয় হইল। যুদ্ধে হারিয়া নুরজাহান কৌশলের আশ্রয় লইলেন। তিনি ইচ্ছা করিয়া সম্রাটের শিবিরে গিয়া বন্দিনী হইলেন। তারপর ক্রমে ক্রমে অনেক কর্ম্মচারীকে বশ করিয়া বাদশাহকে মহব্বতের হাত হইতে উদ্ধার করিলেন। বিপদ বুঝিয়া পাঠান সেনাপতি পলাইয়া গিয়া কুমার খুর্‌রমের সহিত যোগদান করিলেন। মহব্বত খাঁর বাহুবল নুরজাহানের বুদ্ধিবলে ব্যর্থ হইল।

ইহার পর জাহাঙ্গীর বেশী দিন বাঁচেন নাই। তাঁহার পর খুর্‌রম বাদশাহ হইলে নুরজাহানের আর কোন প্রতিপত্তি রহিল না। বাকী জীবন তিনি লাহোরে বাদশাহের সমাধির নিকটেই বাস করিয়াছেন। আর তিনি কোন আমোদ উৎসবে যোগদান করেন নাই।

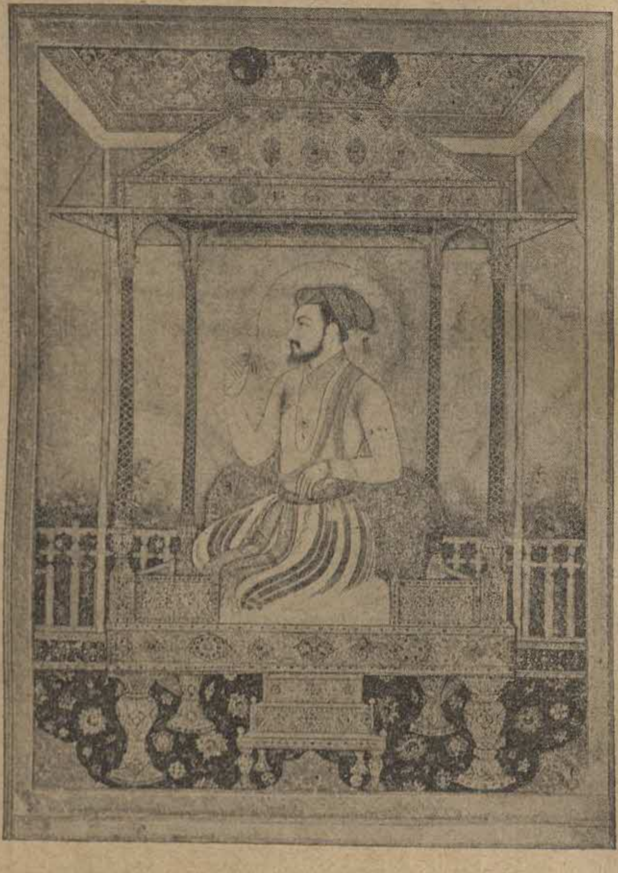
বাদশাহ শাহজাহান ও তাজমহল

খুর্‌রম ইতিহাসে শাহজাহান নামে পরিচিত। শাহজাহানের আমলে মোগল সাম্রাজ্যের খুবই উন্নতি হইয়াছিল। সম্রাটের সুশাসনে প্রজারা সুখে ও শান্তিতে বাস করিত। দক্ষিণে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানেরা শাহজাহানের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে সুবাদার কাসিম খাঁ হুগলীর ফিরিঙ্গীদিগকে কঠোর শাস্তি দিয়াছিলেন। এক সময় কান্দাহারের কেল্লাও শাহজাহানের দখলে আসিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায়ই ইরাণীরা আবার এই দুর্গ কাড়িয়া লইয়াছিল। শাহজাহান একবার মধ্য এশিয়ায় তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষদিগের রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই চেষ্টাও সফল হয় নাই।

শাহজাহান খুব জাঁকজমক ভালবাসিতেন। তাই তাঁহার রাজত্বকালে ভারতবর্ষে কারুশিল্পের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। দিল্লীর বাদশাহী অনেক দিন নষ্ট হইয়া গিয়াছে; কিন্তু শাহজাহান দিল্লী ও আগ্রায় যে সমস্ত মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন এতদিন পরেও তাহাদের শোভা নষ্ট হয় নাই।

বেবাদল খাঁ নামক একজন শিল্পীর তত্ত্বাবধানে বাদশাহ একখানি অতি সুন্দর সিংহাসন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই সিংহাসনখানিতে বারটি থামের উপরে মণিমুক্তাখচিত চব্বিশটি ময়ূরের মূর্ত্তি ছিল। এইজন্য ইহার নাম হইয়াছিল ময়ূর সিংহাসন। এই সিংহাসন তৈয়ার করিতে সাত বৎসর লাগিয়াছিল।

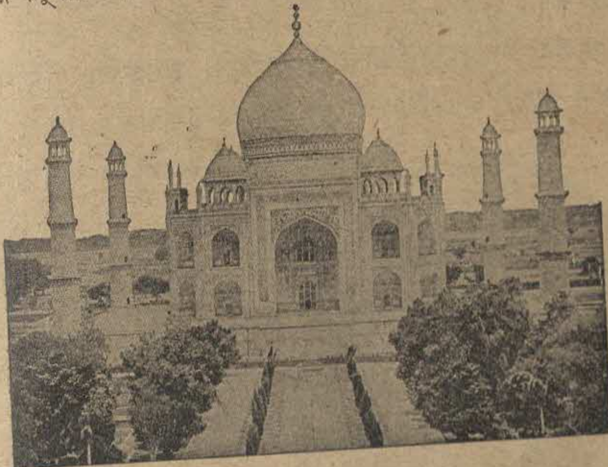
১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে ইরাণের বাদশাহ জোর করিয়া এই সিংহাসনখানি লইয়া গিয়াছিলেন।



ময়ুর সিংহাসনে উপবিষ্ট বাদশাহ শাহজাহান

শাহজাহানের দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, জামি মসজিদ প্রভৃতি সুন্দর অট্টালিকা দেখিতে এখনও নানা দেশের ধনী

পর্য্যটকেরা দিল্লীতে আসেন। শাহজাহানের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি আগ্রায় যমুনার তীরে তাজমহল।



আগ্রার তাজমহল

বাদশাহ হইবার পূর্ব্বে নুরজাহানের ভ্রাতা আসফ খাঁর কন্যার সহিত শাহজাহানের বিবাহ হইয়াছিল। এই মহিলার নাম অর্জ্জুমন্দবানু। বিবাহের পর মেহের উন্নিসার যেমন নুরজাহান নাম হইয়াছিল, আসফ খাঁর কন্যারও তেমনি মমতাজমহল নাম হইয়াছিল। মমতাজমহলকে শাহজাহান অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাঁহাদের দুই জনের বিবাহিত জীবনে কখনও অশান্তি হয় নাই। সম্পদে বিপদে মমতাজমহল সর্ব্বদাই স্বামীর সুখ ও সন্তোষের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। শাহজাহান বাদশাহ হইবার চারি বৎসর পরেই সম্রাজ্ঞী মমতাজমহলের মৃত্যু হয়। শাহজাহান তাঁহার কথা কখনও ভুলিতে পারেন নাই। পত্নীর স্মৃতিরক্ষার্থ তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া যমুনার তীরে শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে একটি

সুন্দর মন্দির রচনা করেন। এই মন্দির নির্ম্মাণ করিতে বিশ বৎসরের বেশী সময় লাগিয়াছিল এবং পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

তাজের কারুকার্য্য কিরূপ সুন্দর তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে বুঝা যায় না। জ্যোৎস্না রাত্রিতে শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত তাজ দেখিলে মনে হয় না যে ইহা পৃথিবীর মানুষের সৃষ্টি। একজন ইংরেজ-মহিলা বলিয়াছেন যে, এরূপ সমাধি-মন্দির পাইলে আমি এখনই মরিতে রাজি আছি। পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্যের মধ্যে তাজ অন্যতম। আমাদের দেশের শিল্পীরাই এই অপরূপ সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছেন—ইহা আমাদের কম গৌরবের কথা নহে।



দারা শিকো

শেষ বয়সে শাহজাহান অনেক দুঃখ-কষ্ট পাইয়াছেন। অনেক দিন রাজত্ব করিবার পর তিনি ভয়ানক অসুস্থ হইয়া পড়েন। বাহিরে গুজব রটিল যে বাদশাহ আর জীবিত নাই, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকো নিজের সুবিধার জন্য পিতার মৃত্যুসংবাদ গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। সম্রাটের অপর তিন পুত্র তখন সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইলেন। চারি ভাইয়ের মধ্যে তৃতীয় আওরঙ্গজেবই ছিলেন

সর্ব্বাপেক্ষা চতুর। তিনি কনিষ্ঠ মুরাদের সঙ্গে যোগদান করিয়া জ্যেষ্ঠ দারা ও মধ্যম সুজাকে পরাজিত করিলেন। তারপর মুরাদকে সরাইয়া নিজে বাদশাহ হইলেন। বৃদ্ধ শাহজাহান আগ্রার দুর্গে বন্দী হইয়া রহিলেন; সাত বৎসর পরে বন্দী অবস্থায়ই তাঁহার মৃত্যু হয়। এই সময় শাহজাহানের বিদুষী কন্যা জাহানারা দিবারাত্র পিতার সেবা করিয়াছিলেন।

আওরঙ্গজেব

বাদশাহ আওরঙ্গজেব পিতা ও পিতামহের ন্যায় জাঁকজমক ভালবাসিতেন না। বাল্যকাল হইতেই তিনি পরিশ্রম করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি নিজের হাতে কোরাণ নকল করিতেন, টুপি বানাইতেন। শাসনসংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র তিনি নিজে পড়িতেন। মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল, তাই শাস্ত্রনিষিদ্ধ কোন কাজ তিনি করেন নাই। সেকালে উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ কেহ মুসলমানধর্ম্মের নিষেধ সত্ত্বেও মদ্যপান করিতেন, কিন্তু বাদশাহ আওরঙ্গজেব কখনও সুরা স্পর্শ করেন নাই। এরূপ চরিত্রবান্ ধার্ম্মিক বাদশাহের আমলে সাম্রাজ্যের উন্নতি হইবার কথা। আওরঙ্গজেবের



আওরঙ্গজেব

রাজত্বকালে একসময় দিল্লীর সাম্রাজ্যের আয়তন খুবই বাড়িয়াছিল। কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায়ই আবার রাজ্যের অবনতি আরম্ভ হয়।

আওরঙ্গজেব কখনও ভুলিতে পারেন নাই যে সিংহাসন লাভ করিবার জন্য তিনি পিতাকে বন্দী করিয়াছিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এইজন্য তিনি মনে করিতেন যে তাঁহার পুত্রেরাও তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে পারে, তাঁহার কর্ম্মচারীদেরও বিশ্বাসঘাতকতা করা অসম্ভব নহে। সুতরাং তিনি কাহাকেও কোন বিষয়ে বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। রাজত্বের প্রথম ভাগে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিদ্রোহী হওয়ায় বাদশাহের এই সন্দেহ আরও বাড়িয়া গিয়াছিল।

আওরঙ্গজেব ধার্ম্মিক হইলেও আকবরের মত ধর্ম্মসম্বন্ধে উদারতা দেখাইতে পারেন নাই। যে "জিজিয়া" কর আকবর হিন্দুদিগের সন্তোষের জন্য রহিত করিয়াছিলেন, আওরঙ্গজেবের আমলে তাহা আবার আদায়ের ব্যবস্থা হয়। সুতরাং তাঁহার সময়ে হিন্দুদিগের বিদ্রোহে সাম্রাজ্য ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। রাজধানীর নিকটেই জাঠেরা নানারূপ উপদ্রব আরম্ভ করিল, বুন্দেলারা বিদ্রোহী হইল এবং সৎনামী নামক হিন্দুসম্প্রদায়ের লোকেরা অশান্তির সৃষ্টি করিল। শিখেরাও এই সময় পঞ্চনদে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু রাজপুত বিদ্রোহেই সম্রাট্‌ বেশী বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

মাড়োয়ারের রাঠোর রাজা যশোবন্ত সিংহ সম্রাটের কার্য্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গিয়াছিলেন। জামরুদে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার অনুচরেরা যশোবন্তের শিশুপুত্র ও বিধবা রাণীকে লইয়া

দেশে ফিরিতেছিলেন। সম্রাট্ তাহাদিগকে রাজধানীতে আটক করিবার চেষ্টা করিলেন। রাঠোর-বীর দুর্গাদাস প্রভুর পুত্র



আওরঙ্গজেবের দরবার

অজিত সিংহকে লইয়া রাজপুতানায় পলাইয়া গেলেন। অজিত সিংহের মাতা মেবারের রাজবংশের কন্যা। সুতরাং মেবারের রাণা

রাজসিংহও তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। রাজপুতানায় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শেষে আওরঙ্গজেবের প্রিয় পুত্র আকবরও রাজপুত সর্দ্দারগণের সঙ্গে যোগ দিলেন। সম্রাট্ অতি কষ্টে এই বিদ্রোহ নিবারণ করিয়া রাজপুতদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে রাজপুতদিগের সহিত বাদশাহের যে সদ্ভাব ছিল, আওরঙ্গজেবের আমলে তাহা লোপ পাইল।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে দুর্দ্দান্ত পাঠানেরা ভয়ানক গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছিল; কিন্তু দক্ষিণাপথের গোলমালে সম্রাট্ একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন।

পিতার রাজত্বকালে আওরঙ্গজেব দুই দুইবার দক্ষিণে সুবাদারী করিয়াছেন। সুতরাং সেখানকার হালচাল তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন। তখনই তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য জয় করিতে চাহিয়াছিলেন। পিতার আমলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারার প্রতিকূলতায় তাহার এই ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই।

এদিকে শিবাজী নামক এক মারাঠা বীর একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়া বিজাপুর ও দিল্লী সাম্রাজ্যের ক্ষতি করিতেছিলেন। বাদশাহের সেনাপতিরা শিবাজীকে কয়েকবার পরাজিত করিয়া-ছিলেন সত্য, কিন্তু মারাঠা শক্তি একেবারে বিনষ্ট করিতে পারেন নাই। গোলকুণ্ডার সুলতানের সাহায্যে শিবাজী নিজের রাজ্য আরও বাড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন। শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সাম্ভাজীও বাদশাহের রাজ্য লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। এদিকে বিদ্রোহী আকবর রাজপুতানা হইতে পলাইয়া গিয়া মারাঠা দেশে সাম্ভাজীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সুতরাং সাম্ভাজীকে দমন করিতে এক বিরাট বাহিনী লইয়া বাদশাহ স্বয়ং দক্ষিণাপথে চলিলেন।

আওরঙ্গজেব দক্ষিণে গিয়া বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয় করিলেন। সাম্ভাজী তাঁহার হাতে বন্দী হইয়া প্রাণ হারাইলেন।



আওরঙ্গজেব বিজাপুর অবরোধ করিতেছেন

কিন্তু মারাঠারা মরিয়াও মরিল না। সাম্ভাজীর বালক-পুত্র শাহু ও বিধবা পত্নী বাদশাহের কর্ম্মচারীদের হাতে ধরা পড়িলে মারাঠারা

শিবাজীর কনিষ্ঠ পুত্র রাজারামকে রাজা করিয়া আওরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। মারাঠাদের দেশ বনে, জঙ্গলে, পাহাড়ে পরিপূর্ণ। বাদশাহী ফৌজের ন্যায় মারাঠাদিগের সাজ-সরঞ্জামের দরকার হইত না। তাহারা প্রায়ই শত্রুদিগের সহিত সামনাসামনি যুদ্ধ করিত না, শত্রুসেনা সরিয়া গেলে তাহাদের দেশ লুণ্ঠন করিত, শত্রুশিবিরে সহসা প্রবেশ করিয়া উপদ্রব করিত। এ রকম যুদ্ধে বাদশাহী সৈন্যেরা অভ্যস্ত ছিল না। তাহারা অনেক মালপত্র লইয়া ধীরে ধীরে চলিত, তাহাদের অনেক রসদ ও সরঞ্জাম লাগিত। আর মারাঠারা চলিত ঝড়ের বেগে। তাহারা আজ এখানে আছে, কাল যাইবে বহুদূরে আর এক জায়গায়। বেগতিক দেখিলে সম্রাটের হাতে কেল্লা ছাড়িয়া পলাইবে। আবার সুবিধা বুঝিয়া প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া কেল্লা দখল করিয়া লইবে। এরূপ শত্রু জয় করা সহজ নহে। অথচ গোলমালের একটা চূড়ান্ত ব্যবস্থা না করিয়াও সম্রাট উত্তরে ফিরিয়া যাইতে পারেন না। পঁচিশ বৎসর অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়াও আওরঙ্গজেব মারাঠাদিগকে দমন করিতে পারিলেন না। রাজারামের মৃত্যু হইবার পর তাঁহার বিধবা পত্নী নাবালক পুত্রের নামেই যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন।

এদিকে সম্রাটের অনুপস্থিতিতে উত্তরে নানারূপ বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইল। জাঠ ও বুন্দেলারা আবার উপদ্রব আরম্ভ করিল। বিদ্রোহীদিগের উৎপাতে খাজানা আর আদায় হয় না। রাজকর্ম্মচারীরাও মনিবের অনুপস্থিতিতে কর্ত্তব্যে মনোযোগ করে না। একা সম্রাট কত দিক দেখিবেন! পুত্রেরা সিংহাসন লাভের আশায় তাঁহার মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে। সেনাপতিরা যে যাহার

কাজ হাসিল করিবার জন্য ব্যস্ত। আওরঙ্গজেবের তখন বয়স হইয়াছে আশী বৎসরেরও বেশী। তখনও তিনি সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যুবকের মত পরিশ্রম করিয়াছেন। কিন্তু মানুষের শক্তির একটা সীমা আছে। কঠিন পরিশ্রমে ও নিরাশায় ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বেই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে দিল্লীর সাম্রাজ্য নষ্ট হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি যে সকল চিঠিপত্র লিখিয়াছেন তাহা পড়িলে বাস্তবিকই দুঃখ হয়।

রাজায় প্রজায় ঐক্য না থাকিলে কোন রাজ্যই টিকিতে পারে না। আওরঙ্গজেবের আমলে সেই জন্য দিল্লীর সাম্রাজ্য দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার পুত্র ও পৌত্রদিগের আমলে বাবর ও আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের বাদশাহী ধ্বংস হইল।

শিবাজী

আহ্‌মদনগরের শেষ রাজার একজন সেনাপতি ছিলেন শাহজী ভোঁসলা। শিবাজী তাঁহার মধ্যম পুত্র। শাহজাহানের আমলে আহ্‌মদনগরের পতন হইল। শাহজী বিজাপুরের সুলতানের চাকরী লইয়া দূর বিদেশে চলিয়া গেলেন। বালক শিবাজী মাতা জিজাবাঈর সহিত পুণার বাড়ীতে রহিলেন। দাদাজী কোণ্ডদেও নামক একজন বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী তাঁহাদের দেখাশুনা করিতেন।

বাল্যকালে শিবাজী মায়ের নিকট রামায়ণ মহাভারতের গল্প শুনিতেন আর স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখিতেন। পুণার

কাছে পাহাড়ে তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতেন, তীর ছুঁড়িতে, তরবারি চালাইতে, বর্শা মারিতে শিখিতেন। ক্রমে ক্রমে সমবয়সী আরও কয়েকটি বালক আসিয়া তাঁহার সঙ্গে জুটিল। দাদাজীর মৃত্যুর পর শিবাজীকে শাসন করিবার কেহ রহিল না। মাতা জিজাবাঈ যাদব রাজবংশের কন্যা। তিনি পুত্রকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন।

সুযোগ বুঝিয়া শিবাজী বিজাপুরের সুলতানের দুই একটি কেল্লা দখল করিতে লাগিলেন। বিজাপুরে তখন বেজায় গোলমাল। সুলতান নাবালক, তাঁহার অভিভাবিকা স্ত্রীলোক, আর কর্ম্মচারীরা আপন আপন স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত। সুতরাং প্রথম প্রথম কেহ শিবাজীর কার্য্যাবলী লক্ষ্যই করে নাই। শেষে তিনি যখন জাউলীর রাজাকে মারিয়া তাঁহার রাজ্য দখল করিয়া লইলেন তখন বিজাপুরের কর্ত্তাদের চৈতন্য হইল।

কিন্তু শিবাজীকে দমন করিতে যাইবে কে? মারাঠা দেশের বনে জঙ্গলে যুদ্ধ করা সহজ নহে। বড় বড় সেনাপতিরাও যুদ্ধে যাইতে বেশী আগ্রহ দেখাইলেন না। শেষে আফজল খাঁ নামক একজন প্রবীণ যোদ্ধা অহঙ্কার করিয়া বলিলেন—এ আর এমন শক্ত কাজ কি? আমি শিবাজীকে বাঁধিয়া আনিতেছি।

আফজল খাঁ বার হাজার সৈন্য লইয়া শিবাজীর রাজ্যে ঢুকিলেন, আর শিবাজীও অমনি প্রতাপগড়ের কেল্লায় আশ্রয় লইলেন। কিছুদিন পরে দুই পক্ষে সন্ধির প্রস্তাব হইল। কথাবার্ত্তা ঠিক হইল, প্রতাপগড়ের কাছে একটা জায়গায় দুই জনে দেখা করিয়া নিষ্পত্তির কথা পাকা করিয়া লইবেন; সঙ্গে কেহই বেশী লোকজন লইতে পারিবেন না। সাক্ষাতের সময় কি

হইয়াছিল কে বলিবে? যাহা হউক, শিবাজীর হাতে আফজলের মৃত্যু হইল। অমনি মারাঠা সৈন্যেরা আফজলের শিবির আক্রমণ করিয়া তাঁহার অনুচরদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল।



ছত্রপতি শিবাজী

বিজাপুরের সুলতান ঠিক করিলেন যে শিবাজীকে শিক্ষা দিতেই হইবে। এদিকে শিবাজীর লোকেরা দিল্লীর বাদশাহের রাজ্যেও উৎপাত করিতেছিল। সুতরাং আওরঙ্গজেবের মামা সায়েস্তা খাঁ

আর বিজাপুরের সর্দ্দার সলাবৎ খাঁ প্রায় একই সময়ে শিবাজীর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। শিবাজী রাত্রির অন্ধকারে পাহ্লালা দুর্গ হইতে পলাইয়া সলাবতের হাত হইতে রক্ষা পাইলেন। এদিকে সায়েস্তা খাঁ পুণা দখল করিয়া বসিয়াছেন। তাঁহাকে না তাড়াইলে আর চলে না। সম্মুখ যুদ্ধে সায়েস্তা খাঁর সঙ্গে পারিবার জো ছিল না। সুতরাং একদিন রাত্রিতে শিবাজী কয়েকজন অনুচরের সঙ্গে একেবারে গিয়া সায়েস্তা খাঁর শয়নকক্ষে ঢুকিলেন। শিবিরে হাজার হাজার শত্রুসৈন্য। ইহাদের মধ্যে কয়েক শত সিপাহী লইয়া ঢুকিতে কতখানি সাহসের দরকার সহজেই অনুমান করিতে পারিতেছ। কোনখানে সামান্য একটু ভুল হইলেই সেদিন আর শিবাজীর রক্ষা থাকিত না। যাহা হউক, ভুলচুক তাঁহার বড় একটা হইত না। সায়েস্তা খাঁর এক ছেলে মারাঠাদিগের হাতে মারা গেল। জানালা দিয়া পলাইতে গিয়া স্বয়ং নবাব সাহেবেরও একটা আঙ্গুল কাটা গিয়াছিল। আওরঙ্গজেব খবর শুনিয়া বিরক্ত হইলেন। তিনি মামাকে দক্ষিণাপথ হইতে বাঙ্গালায় বদলী করিলেন।

বাদশাহের রাজ্যের মধ্যে সুরাটের মত অত বড় বন্দর সেকালে আর ছিল না। সেখানে বহু টাকা পয়সাওয়ালা লোকের বাস, দেশী বিদেশী অনেক সওদাগরের কুঠী। শিবাজী সহসা সুরাট আক্রমণ করিয়া অনেক টাকাকড়ি লুঠিয়া লইয়া গেলেন।

ইহার পর বাদশাহ অম্বরের রাজা জয়সিংহকে শিবাজীর বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। শিবাজী দেখিলেন যে এবার আর নরম না হইলে চলিতেছে না। তিনি অনেকগুলি কেল্লা ছাড়িয়া দিয়া বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিলেন।

তারপর কিসের আশায় জানি না, শিবাজী তাঁহার পুত্র সাম্ভাজী ও অনেক বড় বড় কর্ম্মচারী লইয়া আগ্রায় বাদশাহের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। দরবারের আদব কায়দা তাঁহার জানা ছিল না। তিনি বাদশাহের আচরণে রাগ সামলাইতে না পারিয়া একটু অভদ্রতা করিয়াছিলেন। তাহার 'পর শিবাজী দেখিলেন তাঁহার বাড়ীতে চৌকি পাহারা বসিয়াছে। ভারি মুস্কিল! অনুনয় বিনয়ে ফল হইল না। কিন্তু শিবাজী আওরঙ্গজেবের চেয়ে কম চালাক নহেন। তিনি বাদশাহের অনুমতি লইয়া নিজের অনুচরদিগকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন। তারপর তাঁহার বেজায় অসুখ করিল। অসুখ সারিবার পর তিনি দরবারের আমীর ওমরাহদের বাড়ীতে ঝুড়ি ভরিয়া মেওয়া, মিঠাই পাঠাইতে লাগিলেন। প্রহরীরা পরীক্ষা করিয়া দেখিল ফলের ঝুড়িই বটে, কোন সন্দেহের কারণ নাই। তারপর একদিন সুযোগ বুঝিয়া ফলের ঝুড়িতে বসিয়া শিবাজী ও সাম্ভাজী আগ্রা হইতে বাহির হইলেন। অনেক তীর্থ ঘুরিয়া শিবাজী দেশে ফিরিলেন।

দেশে ফিরিয়াও তিনি কিছুদিন বাদশাহের সহিত বিবাদ করেন নাই। তারপর আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শিবাজী আবার সুরাট লুণ্ঠন করিয়া অনেক ধনরত্ন লইয়া আসিলেন। কয়েক বৎসর পরে ধূমধামের সহিত রায়গড়ে তাঁহার অভিষেক হইল। শেষে তিনি গোলকুণ্ডার সুলতানের সাহায্যে কর্ণাটের কিয়দংশ জয় করিয়া লইলেন। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল পঞ্চাশ কি তিপ্পান্ন। জলে স্থলে তিনি আপনার প্রাধান্য স্থাপিত করিয়াছিলেন। সামান্য জায়গীরদারের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া অশিক্ষিত পার্ব্বত্য জাতির সাহায্যে তিনি একটি

পরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। শিবাজীর পরবর্ত্তী মারাঠা নায়কদিগের প্রতাপে দিল্লীর সিংহাসন পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। উত্তরে সিন্ধুনদ হইতে দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা পর্য্যন্ত মারাঠা সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল।

শিবাজী তাঁহার প্রজাদিগের বন্ধু ছিলেন। এত যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যেও তিনি রাজস্বের সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, প্রজার সুখ শান্তির বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার মত অতি উদার ছিল। তিনি হিন্দুর মন্দির ও মুসলমানের মসজিদের জন্য সমান ভাবে অর্থদান করিয়াছেন। তিনি কখনও কোরাণের অমর্য্যাদা করেন নাই। তাঁহার সিপাহীরা নারীর অপমান অথবা গো ব্রাহ্মণের অনিষ্ট করিতে পারিত না; করিলে প্রাণদণ্ড হইত। রাজাভিষেকের সময় তিনি "গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালক" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। এই জন্য তিনি বৈরাগীর গেরুয়া কাপড়ের পতাকা বানাইয়াছিলেন। তিনি লেখাপড়া জানিতেন না, কিন্তু তাঁহার দরবারে জ্ঞানী ও গুণীদিগের বড়ই আদর ছিল। উত্তর ভারত হইতেও একজন কবি শিবাজীর দরবারে গিয়াছিলেন। মারাঠারা শিবাজীকে শিবের অবতার বলিয়া পূজা করে। ন্যায় ও ধর্ম্মের উপর তাঁহার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া দিল্লীর বাদশাহও মারাঠা রাজ্য ধ্বংস করিতে পারে নাই। মারাঠারা পরে শিবাজীর আদর্শ পরিত্যাগ করিয়াছিল বলিয়াই তাহাদের অত বড় রাজ্য সহসা নষ্ট হইয়া গেল।

লর্ড ক্লাইভ

লেখাপড়া করিয়া ত অনেকেই গাড়ী ঘোড়া চড়ে, কিন্তু মাঝে মাঝে দুই একজন লোক দেখা যায় যাহারা লেখাপড়া না করিলেও গাড়ী ঘোড়া চড়ার চেয়েও ঢের বড় কাজ করিতে পারে। তোমরা আকবর ও শিবাজীর কথা পড়িয়াছ। আমাদের দেশে যিনি ইংরেজ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন তিনিও লেখাপড়া তেমন ভাল জানিতেন না।

রবার্ট ক্লাইভের জন্ম হয় ইংলণ্ডের মার্কেট ড্রেটন নামক একটি ছোট পল্লীতে। বাল্যকালে তাঁহার লেখাপড়ার দিকে তেমন মন ছিল না, দুষ্ট ছেলেদের সর্দ্দারী করিয়া তিনি ফিরিতেন। অল্প বয়স হইতেই তিনি খুব সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। একবার নাকি তিনি গ্রামের গির্জ্জার চূড়ায় উঠিয়া বসিয়াছিলেন।

ক্লাইভের পিতা মোক্তারী করিতেন, তাঁহার আর্থিক অবস্থা বেশী ভাল ছিল না। তিনি দেখিলেন যে এ ছেলেকে দেশে রাখিয়া লাভ নাই। সুতরাং মাত্র সতর বৎসর বয়সে বার্ষিক চল্লিশ টাকা বেতনে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কেরাণী হইয়া ভারতবর্ষে আসেন। সেকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরীতে বেতন বেশী না থাকিলেও খুব আয় ছিল। সুতরাং ক্লাইভের অভিভাবকেরা ভাবিলেন যে ভারতে গিয়া ছেলে যদি ম্যালেরিয়ায় মরে তবে ত গেল, আর যদি বাঁচিয়া থাকে, টাকা কড়ি আনিতে পারিবে।

কেরাণীগিরি ক্লাইভের মোটেই ভাল লাগিত না। তিনি দুই দুই বার পিস্তল দিয়া আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কিন্তু কি জানি কেন দুই দুই বারই পিস্তলের গুলি বাহির হইল না। ক্লাইভ ভাবিলেন, তাহা হইলে ভগবানের ইচ্ছা নয় যে তিনি মরেন। বোধ হয় তাঁহার দ্বারা কোন বড় কাজ হইবে। শীঘ্রই তিনি নিজের যোগ্যতা দেখাইবার সুযোগ পাইলেন।



লর্ড ক্লাইভ

এইবার একটু আগের কথা বলা দরকার। তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আকবরের রাজত্বের শেষ ভাগে ইংরেজরা ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিয়া সুরাটে কুঠী খোলেন। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথম ভাগে ফরাসীরাও বড় এক কোম্পানী গঠন করিয়া ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিলেন। ইহাদের আগে ও পরে ইউরোপের অন্যান্য দেশের লোকেরাও ভারতবর্ষের ধন

দৌলতের কথা শুনিয়া এদেশে আসিয়া হাজির হইয়াছিল। তাহাদের কথা এখন নাই বলিলাম। ক্রমশঃ এদেশে ইংরেজ ও ফরাসী কোম্পানীর ব্যবসায় ও প্রতিপত্তি বাড়ীতে লাগিল। তাঁহারা জায়গা জমি পত্তনি লইয়া অথবা খরিদ করিয়া কুঠী ও কেল্লা বানাইতে লাগিলেন। আত্মরক্ষার জন্য সিপাহী রাখিতে লাগিলেন। সমুদ্রে ত প্রথম হইতেই তাঁহাদের আধিপত্য ছিল।



সুরাটের ইংরেজ কুঠী

এদিকে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লীর বাদশাহের ক্ষমতা ক্রমশঃ কমিতেছিল। দক্ষিণে মারাঠারা প্রবল হইয়া উঠিল। তাহারা গুজরাট মালব প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া লইল। প্রাদেশিক সুবাদারেরাও শেষে আর দুর্ব্বল বাদশাহদিগকে মানিতে চাহিল না। মুখে বাদশাহকে মনিব বলিয়া স্বীকার করিলেও খাজানা পাঠাইবার সময় তাহারা নানা রকম ওজর আপত্তি করিত।

বাদশাহের তখন এমন সাধ্য ছিল না যে তাহাদের শাস্তি দেন। এই ভাবে অযোধ্যার নবাব, বাঙ্গালার নবাব ও দক্ষিণাপথের সুবাদার নিজাম-উল-মুল্‌ক কার্য্যতঃ স্বাধীন রাজা হইয়া বসিয়াছিলেন। নিজামের রাজধানী ছিল হায়দরাবাদে, তাঁহার অধীনে আর্কটে একজন নবাব ছিলেন। ইংরেজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে সম্ভাব ছিল না। তাই এদেশে আসিয়াও তাঁহারা যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। একবার ফরাসীরা ইংরেজদিগের মাদ্রাজ সহর কাড়িয়া লইয়াছিল। এই সময় ক্লাইভ কলম ছাড়িয়া তরবারি ধরিলেন; কেরাণীর চাকরী পরিত্যাগ করিয়া সৈনিকের বৃত্তি গ্রহণ করিলেন।

তখন দেশীয় রাজারা নিজেদের ঝগড়া বিবাদে ইউরোপীয় বণিকদিগের সাহায্য লইতেন। সেবার হায়দরাবাদ ও আর্কটের নবাবী লইয়া বিবাদ আরম্ভ হইল। এই বিবাদে ফরাসীরা এক পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, সুতরাং ইংরেজরা গিয়া অন্য পক্ষে যোগ দিলেন। প্রথম ফরাসী পক্ষেরই জয় হইয়াছিল। ফরাসীদিগের বন্ধু চাঁদা সাহেব আর্কট দখল করিয়া ইংরেজদিগের আশ্রিত মহম্মদ আলিকে ত্রিচিনপল্লী নামক সহরে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইংরেজদিগের এমন সেনাবল ছিল না যে মহম্মদ আলিকে উদ্ধার করিতে পারেন। তখন ক্লাইভের মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল। তিনি বলিলেন যে আর্কটে এখন বেশী সৈন্য নাই। আর্কট আক্রমণ করিলেই চাঁদা সাহেব ত্রিচিনপল্লী ছাড়িয়া নিজের রাজধানীতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইবে। ক্লাইভ নিজেই অল্প কয়েকজন গোরা ও দেশী সিপাহী লইয়া আর্কট দখল করিলেন। চাঁদা সাহেবের লোকেরাও আসিয়া অনেক সৈন্য লইয়া আর্কট

অবরোধ করিল। কিন্তু ক্লাইভ কিছুতেই ভয় পাইলেন না। তাঁহার রসদ ফুরাইয়া আসিতেছিল, কিন্তু তাহাতেও তিনি দমিলেন না। শেষে তিনিই জয়ী হইলেন। দেশবিদেশে তাঁহার খুব নাম হইল।

ইহার অল্প কয়েক বৎসর পরেই বাঙ্গালার নবাব সিরাজদ্দৌলার সহিত কলিকাতার ইংরেজদিগের ঝগড়া বিবাদ আরম্ভ হইল।



সিরাজদ্দৌলা

নবাব ইংরেজদিগকে কলিকাতা হইতে তাড়াইয়া দিলেন। এই খবর পাইয়া ক্লাইভ বাঙ্গালায় আসিলেন। কলিকাতা উদ্ধার করিয়া তিনি নবাবের সঙ্গে সন্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু কয়েক মাস পরেই আবার দুই পক্ষের মনান্তর হইল। নবাবের সেনাপতি মীরজাফর ভিতরে ভিতরে ইংরেজদিগের পক্ষে ছিলেন। পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভ সিরাজদ্দৌলাকে হারাইয়া তাঁহার স্থলে মীরজাফরকে নবাব করিলেন। মীরজাফর মোটেই কাজের লোক ছিলেন না। সুতরাং ইংরেজরাই বাঙ্গালাদেশের কর্ত্তা হইয়া বসিলেন। এই ভাবে বঙ্গদেশে ইংরেজ প্রভুত্বের সূত্রপাত হইল।

নবাব বদল করিয়া ক্লাইভ অনেক টাকা ও বড় জমিদারী পাইয়াছিলেন। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা ভাবিলেন যে নূতন লোককে নবাবী দিলেই রাতারাতি বড়মানুষ হওয়া যাইবে। সুতরাং ক্লাইভ দেশে চলিয়া গেলে কলিকাতার কর্ত্তারা মীরজাফরকে

সরাইয়া তাঁহার জামাই মীরকাসিমকে মুর্শিদাবাদের নবাবী দিলেন। তাঁহারা নূতন নবাবের কাছে অনেক টাকা পাইয়াছিলেন, কিন্তু মীরকাসিম তাঁহার শ্বশুরের মত অলস ও অকর্ম্মণ্য ছিলেন না। কিছু দিন পরেই নবাব মীরকাসিমের সহিত ইংরেজ কোম্পানীর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইংরেজরা এবারও যুদ্ধে জিতিলেন। কিন্তু দেশে নানারূপ অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। বিলাতের কর্ত্তারা এই সমস্ত বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য ক্লাইভকে আবার বাঙ্গালাদেশে পাঠাইলেন।



মীরজাফর

এবার ক্লাইভ দিল্লীর বাদশাহের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া কোম্পানীর জন্য বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ আনিলেন। এতদিন ইংরেজরা নবাবের নামে ক্ষমতা চালাইতে ছিলেন, এখন নিজেদের নামে খাঁজানা আদায় করিবার অধিকার পাইলেন।



মীরকাসিম

এইভাবে ক্লাইভের বাহুবলে ও বুদ্ধিতে ভারতবর্ষের দুইটি প্রদেশে ইংরেজ প্রভুত্ব স্থাপিত হইল। তিনিও এই যুদ্ধ বিগ্রহের কালে অনেক টাকা

পাইয়াছিলেন। বিলাতের রাজদরবারে তাঁহার খুব আদর হইয়াছিল।

ইংলণ্ডের লোকেরা এখনও ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া ক্লাইভের নাম কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করে।

অহল্যাবাঈ

গরীবের হাতে টাকা পড়িলে তাহার মাথা ঘুরিয়া যায়। এইবার তোমাদিগকে এক মহীয়সী মহিলার কথা বলিব, যিনি কৃষকের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজরাণী হইয়াছিলেন, কিন্তু সম্পদ ও ক্ষমতা পাইয়া কোন দিন তাঁহার একটুও অহঙ্কার হয় নাই। ইঁহার নাম অহল্যাবাঈ।

তোমাদিগকে শিবাজীর কথা বলিয়াছি। (শিবাজীর নাতি শাহুর আমলে প্রধান মন্ত্রী (পেশবা) মারাঠা সাম্রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। পেশবা প্রথম বাজীরাও বাহুবলে মালব জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সেনাপতিদিগের মধ্যে রণোজী ও মহ্লার রাও নামক দুই ব্যক্তি মালব বিজয়ে তাঁহাকে খুব সাহায্য করিয়াছিলেন। ইঁহাদের দুইজনকে পেশবা মালয়ে বড় বড় জায়গীর দিয়াছিলেন। রণোজীর বংশধরেরা এখন গোয়ালিয়রে রাজত্ব করিতেছেন। মহ্লার রাও ইন্দোরের মহারাজার পূর্ব্বপুরুষ।

মহ্লার রাও গরীবের ছেলে। তাঁহার জন্ম হইয়াছিল সামান্য ধাঙ্গড়ের ঘরে। বাল্যকালে তিনি তাঁহার মামার বাড়ীতে থাকিয়া ভেড়ার পাল চরাইতেন। মারাঠাদের তখন উন্নতির সময়

সুতরাং যোগ্যতা থাকিলে তখন সকলেরই বড় হইবার সুযোগ জুটিত। মহ্লার রাও ক্রমশঃ পেশবার সেনাপতি হইলেন, আর মালবের এক বিস্তীর্ণ অংশের শাসনভার পাইলেন।

মহ্লার রাওর একটি মাত্র ছেলে, খণ্ডেরাও। তাহার জন্য তিনি একটি সুলক্ষণা বধূ খুঁজিতেছিলেন। একদিন একটি কৃষককন্যা দেখিয়া তাঁহার খুব পছন্দ হইল। মেয়েটি যে খুব সুন্দরী তাহা নয়, কিন্তু তাহাকে দেখিলেই মনে হইত যে মেয়েটি বড় লক্ষ্মী। তাঁহার নাম অহল্যাবাঈ।



অহল্যাবাঈ

অহল্যাবাঈর সহিত খণ্ডেরাওর বিবাহ হইল। কিন্তু ১৮ বৎসর বয়সেই অহল্যা বিধবা হইলেন। তখন তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কন্যা হইয়াছে। খণ্ডেরাও বীরের মত যুদ্ধ করিয়া মরিয়াছিলেন। অহল্যাও বীরপত্নীর মত সহমরণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু বৃদ্ধ শ্বশুর কাঁদিয়া পড়িলেন। অহল্যার আর মরা হইল না। তিনি শ্বশুরের ঘর সংসার, রাজকার্য্য সমস্তই দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার সুশাসনে খুসী হইয়া প্রজারা তাঁহাকে মায়ের মত ভালবাসিতে লাগিল।

মহ্লার রাওর মৃত্যু হইলে তাঁহার গদিতে বসিলেন অহল্যার পুত্র মালে রাও। দেবীর গর্ভে কেমন করিয়া দানবের জন্ম হইয়াছিল, কে বলিবে? অহল্যা চাহিতেন সকলের চক্ষের জল মুছাইতে, আর লোকের দুঃখ কষ্ট দেখিলেই তাঁহার পুত্রের আনন্দ হইত! অল্প বয়সেই এই কুপুত্রের মৃত্যু হইল। অহল্যা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

কিন্তু তখন আর এক বিপদ উপস্থিত। অহল্যা নিজে ধর্ম্মকর্ম্ম লইয়া থাকিতেই ভালবাসিতেন। দান ধ্যানেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। মহ্লার রাওর ব্রাহ্মণ দেওয়ান ভাবিলেন, কোন মতে যদি অহল্যাকে সরাইয়া এক দত্তক লওয়া যায় তাহা হইলে তিনিই রাজ্যের কর্ত্তা হইতে পারিবেন। তিনি পেশবার কাকা রাঘোবাকে নিজের দলে টানিলেন। রাঘোবাও ফৌজ লইয়া মালবে আসিতে প্রস্তুত হইলেন। খবর পাইয়া অহল্যাবাঈ জ্বলিয়া উঠিলেন, শ্বশুরের কীর্ত্তি তিনি কিছুতেই লোপ পাইতে দিবেন না। তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার সঙ্কল্প দেখিয়া রাঘোবা আর মহ্লার রাওর রাজ্যে হস্তক্ষেপ করিলেন না।

অহল্যাবাঈ শেষে তুকোজী রাও নামক একজন বিচক্ষণ সেনাপতিকে দত্তক লইয়া রাজ্য চালাইতে লাগিলেন। প্রজাদিগের সকল অভিযোগের বিচার তিনি নিজে করিতেন। তিনি বিধবা মানুষ। সামান্য আহার হইলেই তাঁহার চলিত। তাই রাজ্যের টাকা তিনি প্রজার মঙ্গলের জন্য ব্যয় করিতেন। ভারতবর্ষের প্রায় সকল বড় বড় তীর্থে তিনি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ঘাট বাঁধাইয়া দিয়াছেন, আর গরীব দুঃখীকে যে কত টাকা দান করিয়াছেন তাহার সংখ্যা করা যায় না। রাজার ঘরে বিবাহ হওয়ার পর

তিনি রাণী হইয়াছিলেন। পবিত্র চরিত্রের জন্য প্রজারা তাঁহাকে দেবী বলিয়া ভক্তি করিত। যে দিন ঘরে ঘরে দেবী অহল্যাবাঈর মত নারী আসিবে সেদিন ভারতে আর দুঃখ কষ্ট থাকিবে না।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া

রাজা ও রাণীদের দায়িত্ব বড় বেশী। তাঁহাদের এক একটা কাজের উপর লক্ষ লক্ষ লোকের সুখ দুঃখ নির্ভর করে। এই জন্যই মন্দ রাজাকে সকলে এত নিন্দা করে, আর ভাল রাজার এত সুখ্যাতি হয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়া যাট বৎসরেরও বেশী রাজত্ব করিয়াছেন। তাঁহার মত ভাল রাণী সচরাচর দেখা যায় না। এই জন্য প্রজারা তাঁহাকে মায়ের মত ভালবাসিত ও ভক্তি করিত।

পিতার মৃত্যু সময়ে ভিক্টোরিয়ার বয়স খুব অল্প ছিল। তিনি মায়ের কাছে মানুষ হইয়াছিলেন। মা জানিতেন যে একদিন ভিক্টোরিয়ার রাণী হইবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং তিনি তাঁহার শিক্ষার খুব ভাল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এক দিন রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার শিক্ষয়িত্রীকৌশলে তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন যে ভবিষ্যতে তিনি ইংলণ্ডের রাণী হইবেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বোধ হয় এ রকম খবর পাইলে আহ্লাদে আটখানা হয়। কিন্তু মায়ের শিক্ষায় অল্প বয়সেই ভিক্টোরিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে রাণীর জীবন বড় সুখের নহে। তাই তিনি বলিলেন, "তবে আমি আরও ভাল হইবার চেষ্টা করিব।"

ভিক্টোরিয়া যখন রাণী হইলেন তখন তাঁহার বয়স মাত্র আঠার বৎসর। রাত্রিতে ইংলণ্ডের প্রধান পুরোহিত (ক্যান্টারবেরির

আর্চবিশপ) আসিয়া ভিক্টোরিয়াকে জাগাইয়া খবর দিলেন, তাঁহার জ্যেঠা মহাশয় আর নাই, তিনি ইংলণ্ডের রাণী হইয়াছেন। রাণীর চোখ দিয়া তখন জল পড়িতেছে। তিনি ভাঙ্গা গলায় বলিলেন, আপনি আমার জন্য প্রার্থনা করুন।



ভিক্টোরিয়া (১৮ বৎসর বয়সে)

রাণী হইবার কিছুদিন পরে ভিক্টোরিয়ার সহিত তাঁহার মামাত ভাই আলবার্টের বিবাহ হয়। আলবার্টও অত্যন্ত শ্রমশীল ও চরিত্রবান্ পুরুষ ছিলেন। তিনি সমস্ত জনহিতকর কার্য্যে পত্নীকে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের বিবাহিত জীবন বড়ই সুখে কাটিয়াছে। আলবার্টের মৃত্যুর পর রাণী এত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তিনি অনেক দিন প্রাসাদ হইতে বাহির হইতেই পারেন নাই।

ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এই জন্য ইংরেজরা গর্ব্ব করিয়া বলিত যে রাণীর রাজ্যে কখনও সূর্য্য অস্ত যায় না।

তোমাদের মনে আছে যে পলাশীর যুদ্ধ জয় করিয়া ইংরেজরা বঙ্গদেশের প্রভুত্ব লাভ করেন। তারপর ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের



মহারাণী ভিক্টোরিয়া

অনেক রাজ্যই তাঁহারা দখল করিয়া লন। এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করিতেন একটি সওদাগরী কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা। পলাশীর যুদ্ধের ঠিক একশত বৎসর পরে এদেশের হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীরা কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়। এই বিদ্রোহ দমন হইবার পর মহারাণী নিজে ভারতশাসনের ভার গ্রহণ করেন।

ইহার প্রায় বিশ বৎসর পরে তিনি ভারতসম্রাজ্ঞী উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রজাদের মধ্যে নানা জাতি ও নানা ধর্ম্মের লোক ছিল। তিনি সকলেরই সুখ ও উন্নতি আকাঙ্খা করিতেন। প্রজার মঙ্গলের জন্য তিনি আজীবন অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন।

ইংলণ্ডে আর কোন রাজা বা রাণীই ভিক্টোরিয়ার মত এত দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন নাই। তাঁহার রাজত্বের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইলে সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র ধূমধামের সহিত সুবর্ণ জুবিলী উৎসব হইয়াছিল। ইহার দশ বৎসর পরে হইয়াছিল হীরক জুবিলী উৎসব।

৬৩ বৎসর রাজত্ব করিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন ১৯০১ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন, তখন ভারতের সকল প্রদেশের সকল জাতির প্রজাই তাঁহার জন্য অশ্রুপাত করিয়াছে। তাঁহার ন্যায়পরায়ণতার উপর এদেশের লোকের এমন বিশ্বাস ছিল যে পল্লীগ্রামের দরিদ্র লোকেরাও বিপদে পড়িলে মহারাণীর দোহাই দিত। মহারাণীর রাজত্বে যেমন ইংলণ্ডের ধনসম্পদ বাড়িয়াছে তেমনই ভারতবর্ষের নানা প্রকার উন্নতি হইয়াছে।

ভিক্টোরিয়া কখনও ভারতবর্ষে আসেন নাই। অথচ তিনি তাঁহার ভারতীয় প্রজাদিগকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ইহাতেই তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়।

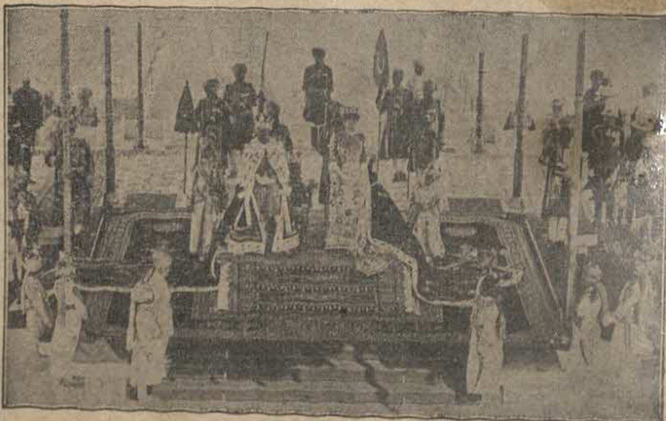
দিল্লীর দরবার

ইংরেজ আমলে কলিকাতাতেই প্রথম ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল। কিন্তু হিন্দুস্থানের মুসলমান বাদশাহেরা দিল্লীতে রাজত্ব করিতেন। দিল্লীর অদূরে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজধানী ছিল। সুতরাং বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে ইংরেজরাও দিল্লীতেই উৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন ভারতবর্ষের সম্রাজ্ঞীর উপাধি ধারণ করিলেন তখন সেই শুভ সংবাদ ঘোষণা করিবার জন্য দিল্লী নগরীতেই ভারতীয় রাজা ও প্রজাসাধারণের একটি বিরাট দরবার আহূত হইয়াছিল। ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সপ্তম এডওয়ার্ড ভারত সম্রাট্ হইলেন। তদুপলক্ষে ভারতের রাজ-প্রতিনিধি লর্ড কার্জ্জন দিল্লীতে একটি দরবার ডাকিয়াছিলেন।

সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ সিংহাসনারোহণ করিবার পর ১৯১১ খৃষ্টাব্দে আবার দিল্লীতে দরবার হইয়াছিল। তাঁহার পিতা বা পিতামহী রাজ্য-শাসনের ভার গ্রহণ করিবার পর ভারতবর্ষে আসেন নাই। কিন্তু পঞ্চম জর্জ্জ স্বয়ং তাঁহার মহিষীকে লইয়া দিল্লীর দরবারে আসিয়াছিলেন। সম্রাটের আগমনে ভারতের নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে আনন্দ উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। তখন দিল্লীতে যে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহাতে প্রাচীনকালের রাজসূয় যজ্ঞের কথা মনে পড়ে। ভারতের ছোট বড় হিন্দু মুসলমান করদ ও মিত্ররাজগণ প্রায় সকলেই এই উপলক্ষে সেখানে সমবেত হইয়াছিলেন। এই দরবারে পঞ্চম জর্জ্জ ঘোষণা

করিয়াছিলেন যে দিল্লী নগরই আবার ভারতের রাজধানী হইবে। শাসনের সুবিধার জন্য বঙ্গদেশ দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। সম্রাট্ প্রজার সন্তোষের জন্য দিল্লীর ঘোষণা দ্বারা এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। আর ভারতীয় সিপাহীদিগকে তিনি



দিল্লীর দরবার

একটি উচ্চ সম্মান লাভের অধিকার দিয়া গেলেন। সম্রাটের অনুগ্রহে ইংরেজ সৈনিকদের ন্যায় এদেশের হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীরাও এখন "ভিক্টোরিয়া ক্রস" লাভ করিতে পারে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় কয়েকজন ভারতীয় সিপাহী অসম সাহসের পরিচয় দিয়া প্রমাণ করিয়াছে যে সম্রাটের অনুগ্রহ অপাত্রে ন্যস্ত হয় নাই।

ভিক্টোরিয়া ক্রস ও সিপাহী খোদাদাদ খাঁ

সোনার নয়, রূপার নয়, সামান্য একটা পিতলের ক্রস। কিন্তু এই অলঙ্কার কামনা করে না এমন সৈনিক বৃটিশ সাম্রাজ্যে নাই। মরণকে যাহারা তুচ্ছ করে, জীবনের ভয় যাহাদের নাই, কেবল তাহারাই বীরত্বের এই পুরস্কার লাভ করিতে পারে।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে তুরস্কের সহিত রাশিয়ার একবার ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে ইংরেজ ও ফরাসীরা তুরস্কের পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন। ইতিহাসে এই মহাসমর ক্রিমিয়ার যুদ্ধ নামে বিখ্যাত। তখন রুশদিগের অনেকগুলি কামান ইংরেজসেনার হাতে পড়িয়াছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়া দেখিলেন যে সেনা-পতিরা সাহস ও বীরত্বের জন্য অনেক পুরস্কার পাইয়া থাকেন, কিন্তু সাধারণ সৈনিকদিগের জন্য সে রকমের কোন ব্যবস্থা নাই। তিনি মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া রুশদের কামান গলাইয়া ক্রস তৈয়ার করাইলেন। ঠিক হইল যে ছোট বড়, উত্তম অধম যে কোন সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে অসাধারণ সাহসের পরিচয় দিবে সেই এই ক্রস পাইবে। যাহারা প্রাণ বিপন্ন করিয়া এই সম্মান লাভ করে তাহাদের নামের শেষে মাত্র দুইটি অক্ষর লেখা থাকে —V. C.। কিন্তু এই দুইটি অক্ষরেই তাহাদের শৌর্য্য ও সাহসের পরিচয় স্পষ্ট হইয়া ওঠে। ক্রসের উপরও লেখা থাকে মাত্র দুইটি



ভিক্টোরিয়া ক্রশ

কথা—For Valour—শৌর্য্যের জন্য। "জীবন মৃত্যু" যাহাদের "পায়ের ভৃত্য" তাহাদের সম্বন্ধে বেশী কথা বলিবার প্রয়োজন কি?

দিল্লী দরবারের কয়েক বৎসর পরই ইউরোপে মহাসমর আরম্ভ হইল। সভ্যজগতে এরূপ ভয়াবহ যুদ্ধ ইতিপূর্ব্বে আর হয় নাই। একদিকে জার্ম্মেণী, অষ্ট্রিয়া ও অন্য কয়েকটি রাজ্য, অপরদিকে ইংরেজ, ফরাসী, রুশ ও অপর কয়টি জাতি। মানুষ মারিবার কত কৌশলই না এই যুদ্ধের সময় বাহির হইয়াছে।

আগে যুদ্ধ হইত জলে ও স্থলে। এবার অন্তরীক্ষেও যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইংরেজ পক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য ভারতের সিপাহীরাও ইউরোপের সমরক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইল। দিল্লীর দরবারে সম্রাট্ ঘোষণা করিয়া গিয়াছিলেন যে সাহস ও শৌর্য্যের পুরস্কার স্বরূপ ভারতীয় সিপাহীরাও ভিক্টোরিয়া ক্রস পাইবে। ভারতবাসীদিগের মধ্যে এই সম্মান প্রথম লাভ করিলেন সিপাহী খোদাদাদ খাঁ।


সিপাহী খোদাদাদ

খোদাদাদ খাঁর নিবাস পঞ্জাবের ঝিলাম জেলায়। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে বেলজিয়ামের এক জায়গায় জার্ম্মাণদিগের সহিত ভারতীয় সিপাহীদিগের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সিপাহীরা দুইটি কামান লইয়া শত্রুদিগের সহিত লড়াই করিতেছিল। জার্ম্মাণদিগের গোলায় সিপাহীদের একটি কামান বিকল হইল। বাকী রহিল

মাত্র আর একটি। এই কামান চালাইতেছিলেন সিপাহী খোদাদাদ খাঁ। বিপক্ষের গোলার আঘাতে চক্ষের সম্মুখে তাঁহার সঙ্গীরা সকলেই নিহত হইল। কিন্তু একাকী খোদাদাদ অসম সাহসে কামান চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার শরীর তখন ক্ষত বিক্ষত, কিন্তু সেদিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। শেষে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তাঁহার যখন জ্ঞান হইল তখন তিনি দেখিলেন যে আশেপাশে কোথাও কেহ জীবিত নাই। তিনি মৃতের স্তূপের ভিতরে পড়িয়া রহিয়াছেন। তখন কোন মতে হামাগুড়ি দিয়া তিনি শিবিরে ফিরিলেন। ইংরেজ সেনাপতিরা তাঁহার অসম সাহসে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে শৌর্য্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার ভিক্টোরিয়া ক্রস প্রদান করিলেন। তারপর গোবিন্দ সিংহ, দরবান সিংহ নেগী, ঈশ্বর সিংহ প্রভৃতি আরও অনেক ভারতীয় বীর এই উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছেন। মহাসমরের সময় ইহাদের বীরত্বে ভারতের গৌরব রক্ষা হইয়াছে।

বিজয় সিংহ

ভারতবর্ষের দক্ষিণে লঙ্কাদ্বীপ। ইহার আর এক নাম সিংহল। লঙ্কার নাম সিংহল হইল কেন?

বঙ্গদেশের রাঢ় অঞ্চলে সেকালে সিংহবাহু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম বিজয় সিংহ। বিজয় সিংহের স্বভাব-চরিত্র তেমন ভাল ছিল না, প্রজারা তাঁহার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। রাজাও নিত্য নূতন নালিশ শুনিতে শুনিতে

জ্বালাতন হইয়া উঠিলেন। শেষে কি পুত্রের জন্য প্রজার অকল্যাণ করিবেন? সিংহবাহু বিজয় সিংহকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

বিজয় সিংহের আর যত দোষই থাকুক, সাহসের অভাব ছিল না। বিপদে পড়িয়া চরিত্রেরও অনেক সংশোধন হইয়াছিল। পিতৃরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া তিনি সাতশত সঙ্গী লইয়া জাহাজে উঠিলেন। কোথায় যাইবেন কিছুই ঠিক নাই। সমুদ্রের ছোট বড় অনেক দ্বীপে সে সময় বাঙ্গালী বণিকদিগের যাতায়াত ছিল। বিজয় নিজে কিছু স্থির করিতে না পারিলেও ভাগ্য তাঁহাকে টানিয়া নিল লঙ্কায়। তাঁহার জাহাজ ঝড়ে পড়িয়া লঙ্কার উপকূলে উপস্থিত হইল।

বিভীষণের বংশের কেহ তখন লঙ্কায় ছিল কিনা জানি না। সেকালে সেখানে একদল অসভ্য লোকের বাস ছিল। তাহাদিগকে যক্ষ বলিত। এই যক্ষদিগকে পরাজিত করিয়া বিজয় সিংহ সেখানকার রাজা হইলেন।

তখন বাঙ্গালাদেশ হইতে আরও অনেক লোক সোনার লঙ্কায় গিয়া হাজির হইল। ভারতবর্ষের পূর্ব্ব উপকূলের রাজাদিগের সহিত বাঙ্গালী রাজার কুটুম্বিতা হইল। বিজয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বাঙ্গালা হইতে লঙ্কায় রাজত্ব করিতে গেলেন। সিংহ বংশের রাজ্য বলিয়া লঙ্কার নাম হইল সিংহল।

এই সিংহল হইতে ইংরেজী নাম সিলোন হইয়াছে। এখনও লঙ্কাদ্বীপের এই নূতন নাম বাঙ্গালীর সাহস ও বাহুবলের পরিচয় দিতেছে।

সুলতান গিয়াসুদ্দীন ও কাজী

এক সময়ে বাঙ্গালাদেশে স্বাধীন মুসলমান সুলতানেরা রাজত্ব করিতেন। এখনও আমাদের দেশের নানা স্থানে তাঁহাদের অনেক কীর্ত্তির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সুলতানদিগের মধ্যে গিয়াসুদ্দীন সেকালে ন্যায়পরায়ণতার জন্য খুব খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

একদিন তিনি তীর ছুঁড়িতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার তীর লাগিয়া একটি বিধবার ছেলের মৃত্যু হইল। বিধবাও কাজীর কাছারীতে গিয়া গিয়াসুদ্দীনের নামে নালিশ করিল। এই কাজীর নাম সিরাজুদ্দীন। তিনি ভাবিলেন যে সুলতান আমার মনিব। তাঁহাকে সাধারণ অপরাধীর মত কাছারীতে ডাকিলে তিনি রাগ করিতে পারেন। আবার বিচারকের পদ গ্রহণ করিয়া যদি আমার কর্ত্তব্য না করি তবে ভগবানের নিকট অপরাধী হইব। সুলতান রাগ করিলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু আমি আমার কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করিব না। এই ভাবিয়া কাজী সুলতানের নিকট একজন কর্ম্মচারী পাঠাইয়া দিলেন।

কাজীর আদেশ পাইবামাত্র সুলতান কাছারীতে আসিলেন। কাজী তাঁহাকে কোন প্রকারের সম্মান না দেখাইয়া বলিলেন— তুমি এই বিধবার পুত্রকে হত্যা করিয়াছ। ইহার যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ না করিলে আইন অনুসারে দণ্ড পাইবে। সুলতান তখনই বিধবাকে অনেক টাকা দিয়া বিচারককে বলিলেন—কাজী সাহেব! বাদিনী আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন, অতএব আপনিও আমাকে অব্যাহতি দিন।

বিচার তখন শেষ হইয়াছে। কাজী আসন হইতে নামিয়া আসিয়া সুলতানকে সসম্মানে সেলাম করিলেন। সুলতান বলিলেন —ভগবানকে ধন্যবাদ যে তুমি আজ রাজার ভয়ে অবিচার কর নাই। আজ যদি ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা না করিতে তবে এই তরবারি দিয়া তোমার মাথা কাটিয়া ফেলিতাম। কাজী হাসিয়া বলিলেন— সুলতান, ভগবানকে ধন্যবাদ যে আপনি আমার হুকুম অমান্য করেন নাই। তাহা হইলে আমি আপনাকে চাবুক মারিতাম। আজ আমাদের দুই জনেরই কঠিন পরীক্ষা হইয়া গেল। ভগবানের অনুগ্রহে আমরা দুই জনই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম।

এমন রাজা ও এমন বিচারক থাকিলে প্রবল দুর্ব্বলের প্রতি কখনও অন্যায় অত্যাচার করিতে পারে না।

বার ভূঁইয়া

স্বাধীন পাঠান রাজাদিগের পতনের পর বাঙ্গালাদেশের জমিদারেরা খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল আকবর ও জাহাঙ্গীরের সুবাদারেরা ইহাদিগকে দমন করেন। এই জমিদারদিগের সৈন্য, সেনাপতি কামান, রণতরী কিছুরই অভাব ছিল না। ইহারা নিজ নিজ, এলাকায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন, বাদশাহের প্রভুত্বও সকল সময় মানিতেন না। এই জমিদারদিগের মধ্যে বার জনের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অধিক ছিল বলিয়া তাঁহাদিগকে দ্বাদশ ভৌমিক বা বার ভূঁইয়া বলিত। বার ভূঁইয়াদের মধ্যে আবার যশোহরের প্রতাপাদিত্য শ্রীপুরের চাঁদ রায় ও খিজিরপুরের ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলি সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

প্রতাপাদিত্যের রাজ্য ছিল বর্ত্তমান যশোহর ও খুলনা জেলায়। তাঁহার মত দানশীল রাজা সে সময় আর ছিল না। একবার তিনি তাঁহার রাণীর হাত দিয়া ব্রাহ্মণদিগকে মোহর দান করিতেছিলেন। দৈবাৎ রাণীর হাত হইতে একটা মোহর কলসীর ভিতর পড়িয়া গেল। রাণী কলস হইতে আর একটি মোহর তুলিয়া ব্রাহ্মণের হাতে দিবেন এমন সময় প্রতাপাদিত্য বলিলেন, যে মোহরটি পড়িয়া গিয়াছে তাহা তুমি চিনিতে পরিবে না। ব্রাহ্মণকে দিবার জন্য মোহর যখন তুলিয়াছিলে তখনই তাহা দেওয়া হইয়া গিয়াছে মনে করিতে হইবে। এখন ঠিক সেই মোহরটি ইহাকে না দিলে দেওয়া জিনিস ফিরাইয়া লওয়ার পাপ হইবে। অতএব কলসী শুদ্ধ সমস্ত মোহরই এই ব্রাহ্মণকে দান কর। প্রতাপাদিত্যের দানধর্ম্মে এমন অনুরাগ ছিল যে একবার তিনি "কল্পতরু" হইয়া বসিয়াছিলেন। সে দিন তাঁহার নিকট যে যাহা চাহিয়াছে তাহাই পাইয়াছে, কেহই নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায় নাই। বাঙ্গালা দেশের একজন জমিদারের পক্ষে এরূপ দান সহজ নহে। এই জন্য সেকালের একজন ভাট প্রতাপাদিত্যের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের তুলনা করিয়াছিলেন :—



প্রতাপাদিত্যের নির্ম্মিত চণ্ড-ভৈরবের মন্দির

"স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ, বাসুকি পাতালে
প্রতাপ আদিত্য রায় অবনীমণ্ডলে।"

সূর্য্যকান্ত গুহ, শঙ্কর চক্রবর্ত্তী, রত্নেশ্বর প্রভৃতি প্রতাপের সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার সেনাবলও ছিল অনেক, কিন্তু সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে ভবানীর কৃপায়ই তিনি বড় হইয়াছেন। প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কবি ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"যশোর নগর ধাম প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাত্‌শায় কেহ নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥
বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতি অযুত তুরঙ্গ সাতি,
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী।"

ধূমঘাট নামক স্থানে প্রতাপাদিত্যের একটি কেল্লা ছিল। জাহাঙ্গীর বাদশাহের আমলে সুবাদার ইসলাম খাঁ প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার জন্য ফৌজ পাঠান। প্রতাপ বন্দী হইয়া কিছু দিন ঢাকায় ছিলেন। প্রবাদ যে দিল্লীর পথে কাশীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। সুবাদারের ফৌজ যখন প্রতাপের রাজধানীতে প্রবেশ করিল তখন প্রতাপাদিত্যের রাণী শরৎকুমারী অন্যান্য মহিলার সহিত জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি যেখানে ডুবিয়া মরিয়াছিলেন তাহার নাম "শরৎখানার দহ।"

যশোহরের প্রতাপের মত শ্রীপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়ও সেকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়

যে চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের সম্পর্কে এখনও সঠিক জানা যায় নাই। কেহ বলেন চাঁদ রায় কেদার রায়ের ভ্রাতা ; আবার কাহারও মতে চাঁদ রায় কেদার রায়ের পুত্র।

যোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে রেলফ্ ফিচ্ নামক একজন ইংরেজ পর্য্যটক বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি বার ভূঁইয়াদের মধ্যে তিন জনের রাজধানী দেখিয়া গিয়াছেন। চট্টগ্রাম হইতে তিনি চন্দ্রদ্বীপের (বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ জেলার) রাজধানী বাকলায় গমন করেন। সেখানে তখন অনেক চাউল, সূতী ও রেশমী কাপড় উৎপন্ন হইত। তিনি লিখিয়াছেন, "বাকলা হইতে আমি গঙ্গাতীরে শ্রীপুর গমন করি। এখানকার রাজার নাম চান্দেরী (চাঁদ রায়)। ইহারা সকলেই জালালুদ্দীন আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে। এই নদীবহুল দেশে বাদশাহের অশ্বারোহী সেনা ইহাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না।"

চাঁদ রায়ের অনেক রণতরী ছিল। কার্ভালো নামক একজন পর্ত্তুগীজ তাঁহার নৌসেনাপতি ছিলেন। কার্ভালোর সাহায্যে শ্রীপুরের রাজা সন্দ্বীপ দখল করেন। এই উপলক্ষে আরাকানের মগরাজার সহিতও তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং বুঝিতে পারিতেছ যে শ্রীপুরের রাজারা নিতান্ত সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না। শ্রীপুর এখন পদ্মার গর্ভে। কিছু দিন আগেও রাজবাড়ীতে শ্রীপুরের রাজাদিগের নির্ম্মিত একটি প্রকাণ্ড মঠ দেখা যাইত। কয়েক বৎসর হইল তাঁহাদিগের এই শেষ কীর্ত্তি পদ্মার গর্ভে গিয়াছে। এই ভাবে বাঙ্গালী জমিদারদিগের যে কত কীর্ত্তি নষ্ট হইয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না।

প্রতাপাদিত্যের রাজ্য গিয়াছিল ইসলাম খাঁর আমলে, আর

শ্রীপুর নষ্ট করিয়াছিলেন অম্বরের রাজপুত রাজা মানসিংহ। মানসিংহ নাকি একগাছি সোনার শিকল ও একখানা তরবারী শ্রীপুর রাজার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীপুররাজ সোনার শিকল পরিয়া স্বাধীনতা ত্যাগ করিতে চাহিলেন না, তিনি তরবারি গ্রহণ করিলেন। বাদশাহের স্থবাদারের সঙ্গে সামান্য বাঙ্গালী জমিদার কত দিন যুদ্ধ চালাইবেন? কিন্তু সে সময় বিক্রমপুরের বীরেরা যে সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে বাঙ্গালী চিরকালই গৌরব বোধ করিবে।



রাজবাড়ীর মঠ

শ্রীপুর হইতে রেলফ্ ফিচ্ সোনারগাঁও গমন করেন। তখন ঈশা খাঁ সেখানকার রাজা। ইংরেজ পর্য্যটক বলেন যে, ভূঁইয়াদিগের

মধ্যে ঈশা খাঁই ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। বঙ্গদেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাপড় তখন সোনার গাঁয়ে তৈয়ার হইত। সেখান হইতে অনেক কাপড় ও চাউল ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে, সিংহলে ও সুমাত্রায় রপ্তানি হইত।

ঈশা খাঁর রাজ্য ছিল বর্ত্তমান ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায়। তিনি বাহুবলে বাইশটি পরগণার মালিক হইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে তিনি একবার মানসিংহের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। যুদ্ধে মানসিংহের তরবারি ভাঙ্গিয়া যায়। নানা কারণে শ্রীপুরের রাজাদিগের সহিতও তাঁহার বিরোধ হইয়াছিল। তিনি খাল ও জলাশয় খনন করিয়া প্রজাদিগের অনেক উপকার করিয়াছিলেন।

প্রতাপাদিত্য, চাঁদ রায়, ঈশা খাঁ প্রভৃতি বাঙ্গালী বীরের কথা মনে করিলে বিশ্বাস হয় না যে বাঙ্গালী আর কোন দিন সামরিক গৌরব লাভ করিতে পারিবে না।

রাণী ভবানী

বেশী দিনের কথা নহে। বাঙ্গালায় ইংরেজ প্রাধান্য কেবল আরম্ভ হইয়াছে। তখন বাঙ্গালার জমিদারদিগের মধ্যে নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্র ও নাটোরের রাণী ভবানী ধনে, মানে, প্রতিপত্তিতে প্রধান ছিলেন। রাণী ভবানীর সঙ্গে একমাত্র ইন্দোরের অহল্যাবাঈর তুলনা হয়।

নাটোরের প্রথম রাজার নাম রামজীবন। তিনি বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনন্দন নবাব সরকারে চাকরী করিয়া মস্ত জমিদারী পাইয়াছিলেন। রঘুনন্দনই নাটোর রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। দুই ভাইয়ের কাহারও পুত্র ছিল না।

সুতরাং রামজীবনের মৃত্যুর পর তাঁহার পোষ্য পুত্র রামকান্ত নাটোরের জমিদারী পাইলেন। রাণী ভবানী এই রামকান্তের সহধর্ম্মিণী। তিনি ছাতিনগাঁয়ের আত্মারাম চৌধুরীর কন্যা।

রামকান্তের মৃত্যুর পর রাণী ভবানীর উপর জমিদারীর ভার পড়িল। তাঁহার পুত্র ছিল না। একমাত্র কন্যা তারাসুন্দরীও পরে বিধবা হইয়াছিলেন। পুণ্যবতী ভবানী তাঁহার সমস্ত আয় দানধর্ম্মে ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার দেওয়ান দয়ারাম দিঘাপাতিয়ার মহারাজের পূর্ব্বপুরুষ।

এই বিচক্ষণ কর্ম্মচারীর ব্যবস্থায় রাণী ভবানীর জমিদারীতে কোন বিশৃঙ্খলা হয় নাই।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামক দুর্ভিক্ষের সময় রাণী ভবানী লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া দীন দরিদ্রকে আহার দিয়াছেন। অন্নদান ছিল তাঁহার নিত্যব্রত। তিনি কেবল মানুষের সেবা করিয়া তৃপ্ত হন নাই। পশুপক্ষী এমন কি পিপীলিকাকেও তিনি আহার যোগাইতেন। কাশীধামে তাঁহার অনেক পুণ্যকীর্ত্তি আছে। বাঙ্গালার নানাস্থানে তিনি দেবসেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

রাণী ভবানী সন্ন্যাসিনীর মত জীবন যাপন করিতেন। তিনি রামকৃষ্ণ নামক এক ধর্ম্মপ্রাণ বালককে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ ধর্ম্মকর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন, তাই তাঁহার আমলে নাটোরের জমিদারী অনেক কমিয়া গিয়াছিল।

রাণী ভবানীর মত আদর্শ মহিলা ও প্রজাহিতৈষী জমিদার সকল দেশেই বিরল।

সমাপ্ত

